ভে তরে

খসে পড়ছে 'মা-মাটি-মানুষে'র ঝুটা আবরণ ... ২
রাজ্যের বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ... ৩
রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে অর্ডিনান্স কেন? ... ৪
খাদ্যশস্য ঃ বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা ... ৫
শোক সংবাদ ... ৬
পদোন্নতির প্রহসন ... শ্রমমন্ত্রীর দপ্তরে ... ৭

আজকের দেশব্রতী

₹২

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১০০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৫০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ১৮ সংখ্যা ৪১ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ১ ডিসেম্বর ২০১১

খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ বাতিল কর!

২৪ নভেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা বহু ব্র্যাণ্ডের পণ্যের খুচরো ব্যবসায় ৫১ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে। এর দ্বারা দেশের পুরো খুচরো ব্যবসার বাজারটিরই দরজা বিদেশি বহুজাতিকদের জন্য খুলে দেওয়া হল। পাশাপাশি, এক ব্র্যাণ্ডের পণ্যের খুচরো ব্যবসায় এতকাল যে ৫১ শতাংশ বিদেশি লগ্নির অনুমতি ছিল, তার সীমা বাড়িয়ে পুরো ১০০ শতাংশ করা হল।

এই সিদ্ধান্তের পিছনে যুক্তি হিসাবে বলা হয়েছে, এর ফলে নাকি খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি কমানো যাবে ও দেশের মুদ্রাস্ফীতির সংকটের একটা স্থায়ী সমাধান পাওয়া যাবে। ২০১১-১২ সালের বাজেট বক্তৃতাতেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের সপক্ষে ভূমিকা করে বলেছিলেন, দেশের ৪০ শতাংশ ফলমূল ও শাকসব্জী সংরক্ষণের ব্যবস্থার অভাবে নষ্ট হয়ে যায় ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাইকারি দাম ও খুচরো দামের মধ্যে বিপুল ফারাক থাকে। ভাবটা এমন যেন খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ এলেই এই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এইসব ছেঁদো যুক্তি আদপেই ধোপে টেকে না। খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি বা আর যেসব সমস্যার দাওয়াই হিসাবে খুচরো ব্যবসায় বিদেশি লগ্নি আনা হচ্ছে, সেইসব সমস্যার মূল কারণ দেশের গভীর কৃষি সংকট এবং সেই কৃষি সংকটের মূলে রয়েছে, সাম্রাজ্যবাদ ও বহুজাতিক বীজ-সার-কীটনাশক কোম্পানিগুলির দ্বারা নির্দেশিত কেন্দ্রীয় কৃষিনীতি। কেন্দ্রীয় সরকার একদিকে দেশি-বিদেশি কোম্পানিগুলিকে বিপুল পরিমাণ করছাড় দিয়ে চলেছে, আর অন্যদিকে কৃষিতে আনুপাতিক বিনিয়োগ ক্রমাগত কমেই চলেছে। কৃষিতে বিনিয়োগের এই ঘাটতি মেটাতে কেন্দ্রীয় সরকার বেছে নিয়েছে বিদেশি বিনিয়োগের রাস্তা, এবং তাও শুধুমাত্র কৃষিপণ্যের বিপণনের খুচরো ব্যবসায়। বিদেশি বিনিয়োগ ডেকে আনলেই যে পরিকাঠামোগত সমস্যা আপনাআপনিই সমাধান হবে না তার প্রমাণ, হিমঘরে ইতিমধ্যেই ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি রয়েছে, অথচ কোন বিদেশি সংস্থাই আসেনি হিমঘরে বিনিয়োগ করতে। আসলে মতলবটা রয়েছে আরও গভীরে।

১৯৯৩ সালেই সেদিনের অর্থমন্ত্রী, আজকের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে আসার পথ সাফ করার জন্য আইনগত পরিবর্তন সেরে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ১৯৯৬ সালে, রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে সেই আইন বাতিল হয়ে যায়। ঠিক তার পরের বছরই ১৯৯৭ সালে, *ক্যাশ অ্যাণ্ড ক্যারি* ব্যবসায় ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়। ২০০৬ সালে এই অনুমতি আপনাআপনি দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ একই বছর, সরকারের আগাম অনুমোদন সাপেক্ষে শুধুমাত্র একটি ব্র্যাণ্ডের ক্ষেত্রে খুচরো ব্যবসায় ৫১ শতাংশ পর্যন্ত বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি মঞ্জুর হয়। 'মার্কস্' ও 'স্পেন্সার' ইত্যাদি খুচরো ব্যবসার চেইনগুলি এই বর্গের মধ্যে পড়ে। গত কয়েক বছর ধরেই কেন্দ্রীয় সরকার মাল্টি ব্র্যাণ্ড বা বহু পণ্যের খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রটিকেও বিদেশি বিনিয়োগের জন্য খুলে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে আসছে। বিশ্বজোড়া আর্থিক সংকটের মুখে বিদেশি বহুজাতিকদের চাপের সামনে নতি স্বীকার করে শেষ পর্যন্ত সেটা বাস্তবায়িত করা হল।

ভারতে খুচরো ব্যবসার পরিমাণ ২০০৬-০৭ সালে ৩২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বার্ষিক ১৩ শতাংশ হারে বেড়ে ২০১১-১২-তে ৫৯০ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়াবে। এর মধ্যে অসংগঠিত খুচরো ব্যবসার পরিমাণ যথাক্রমে, ৩০৯ এবং ৪৯৬ বিলিয়ন ডলার। এই পর্যায়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রের অধীনস্থ খুচরো ব্যবসার বার্ষিক বৃদ্ধির হার থেকেছে মাত্র ১০ শতাংশ, আর তার বিপরীতে সংগঠিত খুচরো ব্যবসার বৃদ্ধি হচ্ছে ৪৫ থেকে ৫০ শতাংশ হারে এবং ২০১২-র মধ্যে দেশের মোট খুচরো ব্যবসায় সংগঠিত ব্যবসার ভাগ ১৬ শতাংশে পৌঁছবে। ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রায় ১.৫ কোটি খুচরো ব্যবসার দোকান আছে। তার

পাঁচের পাতায় দেখুন

শাকসব্জী সংরক্ষণের ব্যবস্থার অভাবে নষ্ট হয়ে যায় ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাইকারি দাম ও খুচরো দামের মধ্যে বিপুল ফারাক থাকে। ভাবটা এমন যেন খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ এলেই এই যে পরিকাঠামোগত সমস্যা আপনাআপনিই সমাধান হবে না তার প্রমাণ, হিমঘরে ইতিমধ্যেই ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি রয়েছে, অথচ কোন বিদেশি সংস্থাই আসেনি হিমঘরে পর্যন্ত বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি মঞ্জুর হয়। 'মার্কস্' ও 'স্পেন্সার' ইত্যাদি খুচরো ব্যবসার চেইনগুলি এই বর্গের মধ্যে পড়ে। গত কয়েক বছর ধরেই কেন্দ্রীয় সরকার মাল্টি ব্র্যাণ্ড বা বহু পণ্যের দেশের মোট খুচরো ব্যবসায় সংগঠিত ব্যবসার ভাগ ১৬ শতাংশে পৌঁছবে। ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রায় ১.৫ কোটি খুচরো ব্যবসার দোকান আছে। তার

পাঁচের পাতায় দেখুন

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কেন্দ্রীয় সরকারের জমি অধিগ্রহণ বিল বাতিল ও কৃষি জমি সংরক্ষণ আইন প্রণয়নের দাবিতে ৩০ নভেম্বর নয়াদিল্লীতে সংসদের সামনে সারা ভারত কিষাণ মহাসভার আহ্বানে "কৃষক জনশুনানী" সংগঠিত হয়। ঐদিন পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে—সিঙ্গুরে কৃষকদের জমি ফেরত ও কৃষক সহ কৃষিমজুর, বর্গাদার, পাট্টাদারদের বিগত ৬ বছরের ক্ষতিপূরণের দাবিতে রাজ্যজুড়ে জেলা শাসকের দপ্তরে "গণ অবস্থান" সংগঠিত হয়। পত্রিকা ছাপাখানায় যাওয়ার আগে রিপোর্ট না আসতে পারার কারণে এই সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না। আগামী সংখ্যায় ঐ রিপোর্ট প্রকাশিত হবে।

মাওবাদী নেতা কিষেণজীর মৃত্যুর তদন্ত দাবি

সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ২৫ নভেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়—"পশ্চিম মেদিনীপুরের বুড়িশোল জঙ্গলে যৌথবাহিনীর গুলিতে শীর্ষস্থানীয় মাওবাদী নেতা 'কিষেণজী'র মৃত্যু হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। ঘটনাটি সন্দেহজনক।

আমরা অবিলম্বে এই মৃত্যুর বিচার বিভাগীয় তদন্ত করার দাবি জানাচ্ছি। এই তদন্ত হাইকোর্টের কর্মরত বিচারপতি দিয়ে করানো প্রয়োজন এবং দ্রুত এই তদন্তের রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। অবিলম্বে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার ও 'অপারেশন গ্রীণ হান্ট' বন্ধেরও দাবি জানাচ্ছি।"

পরিবহন শ্রমিকদের সংগ্রামের সমর্থনে এ আই সি সি টি ইউ-র অবস্থান বিক্ষোভ

এ আই সি সি টি ইউ-র পক্ষ থেকে গত ২৯ নভেম্বর ধর্মতলা মেট্রো চ্যানেলের সামনে সরকারি পরিবহন শ্রমিকদের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচী হয়। সভায় শতাধিক পরিবহন কর্মী অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন সি টি সি বি ডি কে এস ইউনিয়নের পক্ষে গৌরাঙ্গ সেন, সমীর ব্যানার্জী, অল ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট সংগ্রামী শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা বলরাম মাঝি, এ আই এস এ-র দেবমাল্য হালদার, এ আই সি সি টি ইউ-র পক্ষে দ্বৈপায়ন ব্যানার্জী, রেল শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা এন এন ব্যানার্জী, সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির নেত্রী ইন্দ্রাণী সেন, বি সি এম এফ-এর নবেন্দু দাশগুপ্ত, এ আই সি সি টি ইউ-র সাধারণ সম্পাদক বাসুদেব বসু এবং রাজ্য সম্পাদক দিবাকর ভট্টাচার্য ও পার্টির রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ। গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন নীতীশ রায় ও জ্যোতি ভট্টাচার্য। সভা পরিচালনা করেন এ আই সি সি টি ইউ-র রাজ্য নেতা বিভাস বোস।

অবস্থান সভা থেকে পাঁচজনের এক প্রতিনিধিদল মহাকরণে শ্রমমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেন। প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি শ্রমমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসুর হাতে দেওয়া হয়। শ্রমমন্ত্রী পরিবহন কর্মীদের বেতন, বোনাস, ডিএ, গ্র্যাচুইটি ও পেনশনের যে অব্যবস্থা চলছে তা দ্রুত সমাধান করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সি এস টি সি সংগ্রামী শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা বিশ্বরঞ্জন সরকার, সি টি সি বি ডি কে এস-এর নেতা হরিশচন্দ্র সরকার, এ ডব্লিউ বি এস টি এস এস কে-এর নেতা মানস বোস এবং এ আই সি সি টি ইউ নেতা দিবাকর ভট্টাচার্য ও বাসুদেব বসু।

ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেল চত্বরে অবস্থান বিক্ষোভে বক্তব্য রাখছেন দিবাকর ভট্টাচার্য। আলোকচিত্র ঃ বাবলু

সম্পাদকীয়

সেই ট্র্যাডিশন ..... আধিপত্য এখন পরিবর্তিত রঙের

কলকাতার উত্তরের নগরায়ণের অন্তর্ভুক্ত কেষ্টপুরের সদরে দিনেদুপুরে এক যুবককে খুন হয়ে যেতে দেখা গেল। অপরাধীরা এসেছিল মোটর বাইকে চড়ে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে, আর অবলীলায় অপারেশন সেরে সরে পড়ে। গুলিবিদ্ধ যুবকটি এলাকায় ব্যাপকভাবেই পরিচিত, পেশাগতভাবে ইমারতী কারবারে লিপ্ত বহুকাল ধরে, রাজনৈতিক পরিচিতিও বেশ বুক বাজিয়ে 'তৃণমূল'। তবে ঐ অঞ্চলে তৃণমূলের সাংসদ-বিধায়ক-নেতা-মন্ত্রী-দাদা-দের মধ্যে যে বিরাট গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছে এবং তার ফলে যে খুনোখুনিও চলে সেটা প্রকাশ হয়ে গেল উপরোক্ত যুবক খুনের ঘটনার পরে। যে তৃণমূল সাংসদ সবার আগে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন, ঘটনাস্থলটা তাঁর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে, তিনি নিহতের দলীয় কর্মী পরিচয় স্বীকার করে নিলেও খুনের নির্দিষ্ট সম্ভাব্য কারণ ও খুনীদের পরিচিতির ব্যাপারে নির্লিপ্ত থেকে যান, অবশ্য বলাবাহুল্য যে—ঘটনাটা যে অপরাধীরা ঘটিয়েছে সেটা বলেছেন। তিনি অপরাধীদের চিহ্নিত করার বিষয়টিকে পুলিশের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু একবারের জন্যেও তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের উপর নির্ভর করার কথা বলেননি। পুলিশ নিশ্চয় প্রশাসনের হয়ে ঘটনার জন্য দায়ী অপরাধীদের তালাশ করবে, কিন্তু তবু প্রশ্ন হল, ঘটনাস্থলটা যেহেতু তৃণমূলের সাংসদ ও বিধায়কদের কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে এবং সেখানে যেহেতু তৃণমূলের সংগঠন রয়েছে, তাহলে এই খুনের কিনারা খুঁজতে তৃণমূলের সাংসদ দলের স্থানীয় শাখার উপর ভরসা রাখতে পারলেন না কেন! তিনি জোর গলায় এই খুনের সাথে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই দাবি করতে পারলেন, কিন্তু কি কারণ থাকতে পারে তার কোন ইঙ্গিত দিতে পারলেন না কেন! খুব ঠান্ডা মাথায় সেটা এড়িয়ে গেলেন! শেষের সন্দেহই গাঢ় হয়। আর সেটা স্পষ্ট হল অনতিবিলম্বেই তৃণমূলের দুই 'স্বনামধন্য' বিধায়ক তথা মন্ত্রীর—রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রীর পরস্পর বিরোধী মন্তব্যে।

ঐ কেন্দ্রের বিধায়ক রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী। তিনি নিহত যুবক সম্পর্কে 'যা কিছু বলার পুলিশ বলবে' বলেও প্রকারান্তরে বলেই ফেলেছেন যে, ইমারতী কারবার থেকে শুরু করে তোলাবাজী, খুনোখুনি ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকার জের হিসেবেই এই ঘটনা। আবার এই শ্রমমন্ত্রীর বিরুদ্ধেই এলাকায় দলবাজী করার অভিযোগ রয়েছে স্থানীয় সবচেয়ে পুরোনো তৃণমূল কর্মী দাবি করা যুবকদের। এই অভিযোগ স্বভাবতই শ্রমমন্ত্রী অস্বীকার করছেন, করবেন। অন্যদিকে, এই বিধানসভা কেন্দ্র তাঁর না হলেও যুবক খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বয়ং রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপের আসরে নেমে পড়েছেন, শুধু তাই নয়, তিনি নিহত যুবককে এলাকার 'নিবেদিত প্রাণ' তৃণমূল কর্মী বলে দাবি করেছেন। পরন্তু তিনি এই খুনের পিছনে রাজ্যের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সি পি এম থেকে তৃণমূলে ঢুকে ইমারতী কারবারে লিপ্ত হওয়া অপরাধীদের হাত রয়েছে দাবি করেছেন। এই 'দাবি' পাল্টা 'দাবি'র সংঘাতের মধ্য থেকেই আসল সত্যটা বেরিয়ে আসছে। খুনোখুনির এই ঘটনাপ্রবাহ বামফ্রন্ট জমানায় শুরু হওয়া রাজারহাট- নিউটাউন নগরায়ণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়ানো বিষফল হিসেবেই ঘটে আসছে। খুনোখুনি একটা বহিঃপ্রকাশ

খসে পড়ছে 'মা-মাটি-মানুষে'র ঝুঠা আবরণ

মাত্র ৬ মাসের মাথায় তৃণমূল কংগ্রেস জোট সরকারের আসল মুখ বেআব্রু হতে শুরু করল। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করার অভিযোগ এবার উঠেছে খোদ সেই সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের ভেতর থেকে, যাঁরা গত বিধানসভা নির্বাচনে বা তার পরেও তৃণমূলকে প্রকাশ্যে সমর্থন দিয়েছিলেন। মানবাধিকার সংগঠন এ পি ডি আর-কে মেট্রো চ্যানেলে সভা করার অনুমতি শেষ পর্যন্ত বাতিল করার ঘটনা রাজ্যজুড়ে গণতন্ত্রপ্রেমী প্রগতিশীল শক্তির কাছে ধিক্কৃত ও নিন্দিত হয়েছে।

বুদ্ধদেববাবুর সরকারের আচরণের সঙ্গে মমতা ব্যানার্জী পরিচালিত সরকারের বেশ কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সাফল্য পাওয়ার পর সি পি এম নেতৃত্ব মনে করেছিলেন যে শিল্পায়নের স্বপক্ষেই জনতা তাদের রায় দিয়েছে। আর সেই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় ছিল সি পি এমের কাছে 'শিল্পায়ন বিরোধী শক্তি'র বিরুদ্ধে জনগণের সমুচিত জবাব। ঐ ধারণার বশবর্তী হয়ে বুদ্ধদেববাবুরা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে শিল্পায়নের যে মডেল অনুসরণ করতে গেলেন তার করুণ পরিণতির কথা আজ তারা টের পাচ্ছেন। বিগত নির্বাচনে তৃণমূলের নজীরবিহীন সাফল্য, বিধানসভায় একক দল হিসাবেই বিপুল সংখ্যাধিক্য মমতাকে এই 'উপলব্ধি'তে নিয়ে এসেছে যে ৩৪ বছর পর 'প্রকৃত উন্নয়নের' স্বপক্ষে জনগণ তাঁকে গণরায় দিয়েছেন। আর বুদ্ধদেববাবুর মতই ফের 'উন্নয়নের' শ্লোগানকে সামনে রেখে যে কোন বিরোধীতাকে 'উন্নয়ন' বিরোধী তকমা এঁটে কণ্ঠরোধের সুপারিশ করা হচ্ছে।

'উন্নয়নে'র গতিমুখ কি হবে, কোন্ শ্রেণীকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে চলবে উন্নয়নের কর্মকাণ্ড, সাধারণ জনসাধারণকেই বা কিভাবে সামিল করা হবে উন্নয়নী কর্মকাণ্ডে—এই সমস্ত প্রশ্নগুলোর সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফ থেকে মন্তব্য আছড়ে পড়ছে। বুদ্ধিজীবীদের শাসানো হচ্ছে। হুমকি দেওয়া হচ্ছে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার—যা ঠিক একসময়ে বুদ্ধবাবুর কণ্ঠস্বর ছিল। বিরোধী পক্ষের ওপর নেমে আসছে হামলা। একসময় কলেজে কলেজে বিরোধী ছাত্রসংগঠনের বিরুদ্ধে এস এফ আই যেমন হামলা নামাতো, আজ তৃণমূলী ছাত্র পরিষদ সেই একই পন্থা নিয়েছে। বিদ্যাসাগর কলেজে এ আই এস এ বা মেডিকেল কলেজে এম সি ডি এস এ-র ওপর হালফিল আক্রমণ তারই ইঙ্গিতবাহী। যাঁদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঘর করছেন, তাঁরাও তৃণমূলী হামলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। দ্বিতীয় বৃহত্তম শরিক দল হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারে থাকলেও তাঁদের সঙ্গে কোন প্রশ্নেই আলোচনা না করে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার যে অভিযোগ তৃণমূল নেত্রী করছেন, এ রাজ্যে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে সেই একই অভিযোগ উঠছে শরিক দল কংগ্রেসের তরফ থেকে। একসময়ে বামফ্রন্টের ছোট শরিকদলগুলো সি পি এমের বিরুদ্ধে ঐ ধরনেরই অভিযোগ আনতো। শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতি বন্ধের নামে অর্ডিন্যান্স জারি করে কেড়ে নেওয়া হল ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার। এর বিরুদ্ধে এমনকি তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত কিছু বুদ্ধিজীবীও আপত্তি তুলেছেন। প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী সুনন্দ সান্যালের পদত্যাগ শিক্ষানীতির প্রশ্নে তাঁর গুরুতর মতভেদের প্রমাণ। তৃণমূল স্তরে পঞ্চায়েতের মত প্রতিষ্ঠানগুলোর গণতান্ত্রিক পরিসর আরও বিস্তৃত করার বিপরীতে বিডিও-র হাতে অধিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন গণতন্ত্রের ওপরই আঘাত নামানোর আরেকটি দৃষ্টান্ত।

ঠিক যেভাবে নানা অপরাধের আসামী তপন-সুকুরের মতো কুখ্যাত সি পি এম নেতা বামফ্রন্ট আমলে 'ফেরার' হিসাবে পুলিশের খাতায়

পিছনে রাজ্যের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সি পি এম থেকে তৃণমূলে ঢুকে ইমারতী কারবারে লিপ্ত হওয়া অপরাধীদের হাত রয়েছে দাবি করেছেন। এই 'দাবি' পাল্টা 'দাবি'র সংঘাতের মধ্য থেকেই আসল সত্যটা বেরিয়ে আসছে। খুনোখুনির এই ঘটনাপ্রবাহ বামফ্রন্ট জমানায় শুরু হওয়া রাজারহাট- নিউটাউন নগরায়ণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়ানো বিষফল হিসেবেই ঘটে আসছে। খুনোখুনি একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র, অপরাধপ্রবণতা সংঘটিত হয়ে আসছে আরও অনেকরকমের। রাজারহাট-নিউটাউন নগরায়ণের গোড়া থেকেই রয়েছে অন্ধকার জগতের অপরাধ সংঘটিত হয়ে আসার অজস্র ঘটনাবলী। তা যখন বামফ্রন্ট জমানায় চলেছে তখন আধিপত্যের দাপট ছিল সি পি এমের মদতপুষ্ট প্রমোটাররাজ-ইমারতীরাজ-তোলারাজের 'সিন্ডিকেট'-এর। কিন্তু রাজ্য রাজনীতিতে তৃণমূলের মাথা তোলার মধ্য দিয়ে পরিস্থিতিতে শক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন চলে আসতে থাকার সাথে সাথে উত্তরের ঐ 'ব্রাডা' চিহ্নিত অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষমতাবান শক্তিগুলোও ক্রমশ সেখানে ফাটকা অর্থনীতি-রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের দখল বাড়াতে থাকে। দখলদারির এরকম এক কামড়াকামড়ির খবর হয়েছিল 'বৈদিক কান্ড'। ঐ কান্ডে সি পি এমের পাশাপাশি তৃণমূলের 'জনপ্রতিনিধি'দেরও স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল, অগত্যা দুজন বিধায়ককে দল থেকে তাড়িয়ে তৃণমূলনেত্রীকে মুখ রক্ষার উপায় করতে হয়েছিল। এরপর যেহেতু শাসনক্ষমতায় এখন তৃণমূল কংগ্রেস জোট, তাই এখন অর্থনীতি-রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নে আধিপত্য কায়েমের দাপট শুরু হয়েছে তৃণমূলের ছত্রছায়ায়, আর সেই কায়েমী স্বার্থকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের ভেতরে গোষ্ঠীসংঘাত ও খুনোখুনি যে বেড়েই চলবে, এটাই অবধারিত। এই সত্যই প্রকাশ পেল কেষ্টপুরের যুবক খুনের ঘটনায়।

'উন্নয়নে'র গতিমুখ কি হবে, কোন্ শ্রেণীকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে চলবে উন্নয়নের কর্মকাণ্ড, সাধারণ জনসাধারণকেই বা কিভাবে সামিল করা হবে উন্নয়নী কর্মকাণ্ডে—এই সমস্ত প্রশ্নগুলোর কোন সদুত্তর আজ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। মিলছে না এই সরকারের উন্নয়নী পথমানচিত্রের ঠিকানা। ঠিক বাম আমলে যা হয়েছিল। বন্ধ-রুগ্ন কারখানাগুলোকে খোলা বা পুনরুজ্জীবিত করার ওপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করে এ রাজ্যে শিল্পায়নের উদ্যোগ শুরু করার কোন কর্মনীতি যেমন বিগত বাম সরকার তৈরি করতে পারেনি, নতুন সরকারও এ প্রশ্নে কার্যত নীরব। শ্রমিক আন্দোলনকে উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসাবে বুদ্ধবাবুর সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে এই সরকারেরও রয়েছে এই প্রশ্নে অদ্ভুত সাদৃশ্য। ধর্মঘট-বন্ধকে বিরোধিতা করার জন্য আইন প্রণয়নের হুমকি দিচ্ছে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী।

জঙ্গলমহল থেকে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি আজ পুরোপুরি লঙিঘত। নতুন সরকারের বিরুদ্ধে যে কোন সমালোচনা উঠলেই 'মাওবাদী' অথবা 'সি পি এমের বি-টিম' হিসাবে আঘাত নামানোর আরেকটি দৃষ্টান্ত।

ঠিক যেভাবে নানা অপরাধের আসামী তপন-সুকুরের মতো কুখ্যাত সি পি এম নেতা বামফ্রন্ট আমলে 'ফেরার' হিসাবে পুলিশের খাতায় চিহ্নিত হয়ে বুক ফুলিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতো, কেতুগ্রাম খুনের আসামী এক তৃণমূল নেতা (যাকে নাকি পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে) পুলিশী প্রহরায়, তৃণমূলের মন্ত্রীর উপস্থিতিতে খোলা মঞ্চে বক্তৃতা দিল! তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে অধুনা মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর কী অদ্ভুত মিল!

মা-মাটি-মানুষের যে ভণ্ডামিভরা আবরণ সর্বাঙ্গে জড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ক্ষমতায় এলো, তার স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে। ঔদ্ধত্য, আভ্যন্তরীণ কোন্দল, বিরোধী কণ্ঠস্বরকে রোধ করা, বুনিয়াদী শ্রেণীর জীবন্ত দাবিগুলোর প্রতি চরম ঔদাসীন্য ও প্রতিকারে ব্যর্থ এই রাজ্য সরকার আগামী দিনগুলোতে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে। তার বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন ও ব্যাপক জনমত গড়ে তোলাই আজ পরিস্থিতির দাবি।

- অতনু চক্রবর্তী

আজকের
দেশব্রতী
পড়ুন-পড়ান

কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে
জমি অধিগ্রহণ বিল
বাতিল কর!

●

কৃষি জমি সংরক্ষণ আইন
প্রণয়ন কর!

চিলাপাতায় ভূমি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন

জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার ১ নং ব্লকের উত্তর চকোয়াখাতি মৌজার অন্তর্গত চিলাপাতা জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় মূলত আদিবাসী কৃষকের বাস। এখানে ৩৫ বিঘা কৃষিজমি ইতিমধ্যেই পূর্বতন অনুপস্থিত জোতদাররা মাত্র ৫ হাজার টাকা বিঘা দরে বহিরাগত ব্যবসায়ীর হাতে সঁপে দেয় কয়েক বছর আগে। জমিতে বসবাসকারী ভাগ চাষি পরিবারগুলো কানাকড়ি ক্ষতিপূরণ পায়নি। কথা ছিল নতুন মালিক ঐ জমিতে চা বাগান তৈরী করলে পরিবারপিছু একজনের স্থায়ী কর্মসংস্থান হবে।

এখন জমির মালিক চা বাগানের পরিবর্তে প্রতি বিঘা ২ লাখ থেকে ২.২৫ লাখ টাকায় বিক্রি করছে বহিরাগত অ-আদিবাসী তৃতীয় মালিকগোষ্ঠীর কাছে। এরা এই বনভূমি সংলগ্ন জমিতে সমস্ত পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইনকে এড়িয়ে এবং গরিব আদিবাসী আধিয়ারদের জীবন-জীবিকা ধ্বংস করে বহুমূল্য পর্যটক আবাস তৈরী করতে উঠেপড়ে লেগেছে। স্বাভাবিকভাবেই এই সুযোগে মোটা টাকা হাতে আসার সম্ভাবনায় স্থানীয় শাসক শ্রেণীর নেতা ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ মালিক পক্ষের তোষামোদে ব্যস্ত।

অসহায় আদিবাসী কৃষকেরা এই উচ্ছেদের মুখে সি পি আই (এম এল)-এর আলিপুরদুয়ার এরিয়া কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে যোগযোগ করেন। গত ১৭ নভেম্বর ঐ এলাকায় পার্টির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির পতাকাকে সামনে রেখে একটি প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হয়। উচ্ছেদের বিরুদ্ধে তীব্র কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান রেখে বক্তব্য রাখেন জলপাইগুড়ি জেলা সদস্য ও এরিয়া কমিটির সম্পাদক চঞ্চল দাস, জন্মেঞ্জয় সিংহরায়, ব্রাঞ্চ সম্পাদক বিমল বর্মণ, আদিবাসী লড়াকু কৃষক অজিত কিণ্ডো, শ্যামল চিকবরাইক, বিরসা ওঁরাও প্রমুখ।

রাজ্যের বেহাল স্বাস্থ্যব্যবস্থা

পর্যাপ্ত সরকারি বিনিয়োগের বদলে ‘পি পি পি’-র দাওয়াই

পশ্চিমবঙ্গের হালফিল স্বাস্থ্যব্যবস্থার অবস্থাটা বুঝতে হলে প্রথমেই যে ছবিটা সামনে আসছে সেটা হল, সাম্প্রতিককালে ঘটা বেশ কিছু শিশুমৃত্যুর ঘটনা। একই দিনে একই সরকারি হাসপাতালে ১০-১২টি শিশুর মৃত্যুকে কর্তৃপক্ষ ও সরকারের দিক থেকে স্বাভাবিক ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলেও, সাধারণ বুদ্ধিতে তা মেনে নেওয়া শক্ত। প্রথমে দু দুবার কলকাতার বি সি রায় শিশু হাসপাতালে ও তার পরে কয়েকবার মালদার জেলা হাসপাতালে। প্রথম দুটি ঘটনার বিভাগীয় তদন্তে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে পুরোপুরি দায়মুক্ত করা হয়েছে চিকিৎসার অব্যবস্থা ও ঔদাসিন্যের অভিযোগ থেকে।

পাশাপাশি আর একটা ছবিও সম্প্রতি দেখা গেছে, বিশেষ করে চিত্তরঞ্জন মেডিকাল কলেজ ও হাসপাতালে। রোগী-মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রোগীর বাড়ির লোকজনের দ্বারা চিকিৎসক নিগ্রহের বিরুদ্ধে চিকিৎসকদের অভিনব মৌন প্রতিবাদ। নিজেদের প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে তাঁরা তুলে ধরেছেন সরকারি হাসপাতালগুলির করুণ অবস্থাকে। পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক নেই, পরিকাঠামো নেই, ওষুধ নেই, নেই এমনকি গজ-ব্যাণ্ডেজের মত প্রতি মুহূর্তের প্রয়োজনীয় সামগ্রীও, আর নেই বহিরাগতদের হামলার মুখে চিকিৎসকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা। তৃতীয় ছবিটা হচ্ছে, চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্রমাগত অবনতি দেখে হতাশ বেশ কিছু চিকিৎসকের লাইন দিয়ে ইস্তফা দেওয়ার ঘটনা।

অথচ রাইটার্সে বসে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে প্রথমেই যে কাজটা করেছেন সেটা হল, অতর্কিতে হাসপাতাল পরিদর্শন। প্রথম এক সপ্তাহের মধ্যেই বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজি পরিদর্শন ও ডিরেক্টর শ্যামাপদ গড়াইকে সাসপেণ্ড করা। তার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বাঘাযতীন স্টেট জেনারাল হাসপাতালে হানা ও উন্নতির প্রতিশ্রুতি। চলল নতুন নিয়োগের জন্য বাছাই ডাক্তারদের ডেকে আউটডোরে ও ইনডোরে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪২,৪০৮ এবং ৫,৩৩৩। জেলা হাসপাতালগুলোর ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ছিল, ২৪,০২০ এবং ৩,৭৭৩ এবং গ্রামীণ হাসপাতালগুলোর ক্ষেত্রে, ১১,১৭১ এবং ১,৫১০। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মোট ৩৪টি রাজ্যস্তরের হাসপাতাল, ৪৫টি সদর হাসপাতাল, ৩২টি অন্যান্য হাসপাতাল ও ১৬টি জেলা হাসপাতাল আছে, যাতে মোট শয্যার সংখ্যা ২৮,২৮৬টি। এর বাইরে গ্রামীণ এলাকায় রয়েছে ১০,৩৫৬টি স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র, ৯২১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ২৪২টি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ১০১টি গ্রামীণ হাসপাতাল। কিন্তু হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা দিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সংকটটাকে বোঝা যাবে না। সমস্যাটা পরিকাঠামো নিয়ে। ডাক্তার-নার্স নেই, রোগনির্ণয়ের জন্য যন্ত্রপাতি নেই, ওষুধপত্র নেই, আধুনিক পরিষেবা নেই। যেখানে সেগুলো কিছুটা পরিমাণে আছে, সেখানে গিয়ে রোগীরা ভিড় করছে, অথবা কেস রেফার হয়ে আসছে। এটাই স্বাভাবিক। তাই মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপাতালগুলিতে বেড পাওয়া মুস্কিল, অথচ পরিকাঠামোর অভাবে গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে অসংখ্য বেড খালি পড়ে থাকে, কুকুর, বেড়াল, গরু চরে বেড়ায়। ২০১০ সালের তথ্য অনুযায়ী, এ রাজ্যে ব্লক প্রাইমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ২৭১ জন অনুমোদিত শিশুচিকিৎসকের পদে মাত্র ৫৯টিতে ডাক্তার আছেন, অর্থাৎ শূন্যপদ প্রায় ৭৮ শতাংশ।

৬। প্রাণী প্রতিপালন সহ চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থাপনার বাণিজ্যিকীকরণ করা;

৭। জমি-বাড়ি কেনা-বেচা করা, ভেষজ প্রস্তুতকারক সংস্থা গড়ে তোলা, কোম্পানির পক্ষ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা, কোম্পানির ব্যবসা লিজে দেওয়া, বিভিন্ন সফট্ওয়্যার-হার্ডওয়্যার কেনা-বেচা করা, বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহ করা, দেশি-বিদেশি সংস্থার সাথে সমঝোতাপত্র করা, দেশি-বিদেশি সংস্থা অধিগ্রহণ করা ও তাদের শেয়ার কেনা-বেচা করা এবং মার্কেটিং ইন্টেলিজেন্স উইং গঠন করা ইত্যাদি এবং

৮। হিসাবপত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থা রাখা, পরিচালন সংক্রান্ত তথ্য ও মূল্যায়ন, জৈব ও অজৈব উপাদান তৈরি, টয়লেট তৈরি, পরিবহন সংক্রান্ত যন্ত্রাপাতি তৈরি, বিজ্ঞাপনী এজেন্ট হিসাবে ভূমিকা নেওয়া, প্যাকেজিং-এর ব্যবসা, লণ্ড্রি তৈরি, গ্যাস ম্যানেজমেণ্ট-ওয়াটার ট্রিটমেণ্ট-ওয়েস্ট ম্যানেজমেণ্ট, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরি ইত্যাদিও এর অন্যতম লক্ষ্য হবে।

বাম সরকারের আমলেই ডবল্যু বি এম এস সি এল-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ‘পি পি পি’ প্রয়োগ পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। বর্তমানে যে সব পি পি পি-গুলো কাজ করছে সেগুলো হল ঃ

* ৭টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সি টি স্ক্যান ব্যবস্থা ও কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এম আর আই ব্যবস্থা

* বেসরকারি ইউনিটে এম আর আই করানোর দপ্তর একটা চুক্তি করেছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর—এই ৮টি জেলার বুনিয়াদি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নত করার নামে এই চুক্তি করা হয়েছে। কতখানি উন্নতি হয়েছে, তা ঐসব জেলার মানুষরাই বলতে পারবেন।

তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস জোটের পরিবর্তনের সরকার ক্ষমতায় এসেই যে সব প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়েছে, তার মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কেও অনেক ভাল ভাল কথা আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী চলতি বছরের ১৩ জুন নবনিযুক্ত ডাক্তারদের সমাবেশে যে ভাষণ দেন, তার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর ২০১১ থেকে ২০১৫ সালের জন্য একটা ‘প্ল্যান অফ অ্যাকশন’ বা কাজের পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে। তাতে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে নতুন সরকারের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—(ক) আগামী ৫ বছরে এই সরকার মানুষকে সস্তায়, সহজলভ্য, পাকাপাকি, উচ্চমানের জরুরী স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবে; (খ) বিশেষ নজর দেওয়া হবে গরিব, মা, শিশু ও বৃদ্ধ এবং অনুন্নত এলাকায় বসবাসকারী মানুষজনের ওপর এবং (গ) হাসপাতালগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও স্বাস্থ্য সুবিধাগুলির মান উন্নত করা ও তা বজায় রাখা। এর জন্য দশ দফা ‘ফোকাস এরিয়া’ বা বিশেষ নজরাধীন এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। ফোকাস-১ এর মধ্যে আছে, সরকারি হাসপাতালে বুনিয়াদি চিকিৎসার মান নির্ধারণ করা ও তা অর্জন করা, হাসপাতালগুলিতে ভিড় কমানো ও রোগীদের সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ কমানো। ফোকাস-২ হল, প্রচলিত টিকাকরণ প্রক্রিয়ার আওতায় সবাইকে নিয়ে আসা, শিশু মৃত্যুর হার ২৫ শতাংশ, নবোজাত শিশু মৃত্যুর হার ১৫ শতাংশ এবং প্রসূতি মৃত্যুর হার ১০ শতাংশের নীচে নিয়ে আসা। ফোকাস-৩ হচ্ছে, পোলিও, কালাজ্বর ও কুষ্ঠ নির্মূল করা, ছোঁয়াচে রোগের প্রকোপ কমানো—ম্যালেরিয়া, যক্ষা, ডেঙ্গি, ডায়ারিয়া ও হামের দরুণ মৃত্যু ৫০ শতাংশ কমিয়ে

শ্যামাপদ গড়াইকে সাসপেণ্ড করা। তার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বাঘাযতীন স্টেট জেনারাল হাসপাতালে হানা ও উন্নতির প্রতিশ্রুতি। চলল নতুন নিয়োগের জন্য বাছাই ডাক্তারদের ডেকে অকাতরে উপদেশ বিতরণ। জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলোকে সতর্ক করা হল যাতে তারা কথায় কথায় কলকাতার হাসপাতালে 'রেফার' করা বন্ধ করে। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! রাজ্যের হাসপাতাল আছে সেই আগেকার হাসপাতালেই। চারদিকে শুধু নেই নেই আর নৈরাজ্যের রাজ্য।

বিগত বাম সরকারের জমানাতেই হাসপাতালগুলির ও রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থার দুরবস্থা ও দুর্গতির শুরু। বাম জমানায় রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উন্নতি ঘটেছে এটা প্রমাণ করতে বাম সরকারের পেশ করা সর্বশেষ আর্থিক সমীক্ষা (২০১০-১১)-য় দাবি করা হয়েছিল, রাজ্য সরকারি হাসপাতাল থেকে অন্তর্বিভাগীয় চিকিৎসা পেয়ে থাকে প্রায় ৭৩ শতাংশ মানুষ, যেখানে মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা ও তামিলনাড়ুর ক্ষেত্রে অনুপাতটা যথাক্রমে ২৬ শতাংশ, ৩০ শতাংশ, ৩৫ শতাংশ, ৩৬ শতাংশ ও ৩৯ শতাংশ এবং সারা দেশের গড় ৪০ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান এক কঠিন মহাসত্যকে গোপন করে। পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের দ্বারস্থ হওয়া মানুষের সংখ্যা বেশি, কারণ এ রাজ্যের মানুষের দারিদ্র ও আর্থিক সঙ্গতির অভাব। নিতান্ত বাধ্য না হলে কি পশ্চিমবাংলায় আজকাল কেউ হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসে? এই বাধ্যতার কারণই হল, বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর খরচ জোগাড় করার মত সঙ্গতি রাজ্যের বেশিরভাগ মানুষেরই নেই। যদি তা থাকত, তবে এই অনুপাত নিশ্চিতভাবে কমে যেত। তুলনা টানা অন্যান্য রাজ্যগুলিতে সাধারণ মানুষের গড় আর্থিক সঙ্গতি বেশি, তাই তারা সরকারি হাসপাতালের চাইতে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতেই বেশি পছন্দ করে।

২০০৯ সালের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রতি মাসে রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলির চরে বেড়ায়। ২০১০ সালের তথ্য অনুযায়ী, এ রাজ্যে ব্লক প্রাইমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ২৭১ জন অনুমোদিত শিশুচিকিৎসকের পদে মাত্র ৫৯টিতে ডাক্তার আছেন, অর্থাৎ শূন্যপদ প্রায় ৭৮ শতাংশ। যে ক'জন শিশু চিকিৎসক জেলায় কাজ করেন, তাঁরা ঢাল তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের মতন। সুতরাং শহরে রেফার করা ছাড়া তাঁদের আর গতি কি, আর তার পরিণতিতে শিশুমৃত্যু ঘটবে নাই বা কেন?

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ানোর বদলে চিকিৎসা পরিকাঠামোটিকে বেসরকারি হাতে তুলে দিতে বাম সরকারেরই আমলে 'পি পি পি'-র ধারণাটিকে নিয়ে আসা হয় ও তা লাগু করা হয়। ২০০৬ সালেই বাম সরকার 'পি পি পি' পলিসি গ্রহণ করে। ২০০৮-০৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওয়েস্টবেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিসেস কর্পোরেশন (ডবল্যু বি এম এস সি এল) নামে একটা রাষ্ট্রায়ত্ত কর্পোরেশনের জন্ম দেয়, যার হাতে কার্যত হাসপাতালগুলির পরিকাঠামোগত প্রায় সব কাজই তুলে দেওয়া হয়। শুরুতে এই পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির অনুমোদিত শেয়ারের পরিমাণ রাখা হয়েছে ১০ কোটি টাকা। তামিলনাড়ু ড্রাগ কর্পোরেশনের মডেলে এই কর্পোরেশন গঠন করা হয়। এই কর্পোরেশনের কার্যাবলীর মধ্যে রাখা হয়েছে ঃ

১। সমস্ত ধরনের জেনেরিক ও পেটেণ্ট ওষুধ, ড্রাগ ও সমস্ত ধরনের মেডিকেল যন্ত্রপাতি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির জন্য কেনা ও তা সরবরাহ করা;

২। মূলধনী সরঞ্জাম, গাড়ি ও যন্ত্রপাতি কেনা ও সরবরাহ করা;

৩। আধুনিক ওয়্যারহাউস ও ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ গড়ে তুলে বিভিন্ন মেডিকেল যন্ত্রাপতি তৈরি করা;

৪। হাসপাতাল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠানের নক্শা ও বাড়ি তৈরি করা;

৫। গবেষণা ও উন্নয়নের কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং প্যারামেডিকেল পার্সোনেলদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

* ৭টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সি টি স্ক্যান ব্যবস্থা ও কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এম আর আই ব্যবস্থা

* বেসরকারি ইউনিটে এম আর আই করানোর জন্য রেফারাল ব্যবস্থা

* ডায়ালিসিস করানোর জন্য যৌথক্ষেত্রের/বেসরকারি হাসপাতালে রেফারাল ব্যবস্থা

* কলকাতার ৩০টি হাসপাতালের মেকানাইজড্ লণ্ড্রি ব্যবস্থা

* এস এস কে এম হাসপাতালে অডিও ভেস্টিবুলার ব্যবস্থা

* পথ্য, ঝাড়ু দেওয়া ও জঞ্জাল পরিষ্কার, নিরাপত্তা ব্যবস্থার আউটসোর্সিং

* বেসরকারি হাসপাতাল স্থাপন

* রোগীর পরিবারের লোকজনদের রাতে থাকা ও তাদের ব্যবহার্য টয়লেট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুলভ ইণ্টারন্যাশনাল নামক এন জি ও-কে বরাত দেওয়া

* ডি এফ আই ডি-র টাকা নিয়ে ব্লক ও প্রাইমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা এন জি ও-দের এবং অন্যান্য বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া

* গ্রামীণ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির ডায়াগনস্টিক পরিষেবা বেসরকারি হাতে দেওয়া

* সুন্দরবনে মোবাইল চিকিৎসা ব্যবস্থা বেসরকারি হাতে দেওয়া

* এ আই ডি এস নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী এন জি ও-গুলির হাতে তুলে দেওয়া

অন্যান্য ক্ষেত্রেগুলির মধ্যে আছে, পি পি পি-র অধীনে ২১টি এ এন এম স্কুল পরিচালনা করা, বেসরকারি হাসপাতালের সহযোগিতায় আয়ুস্মতী প্রকল্প চালানো, আশা কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া ইত্যাদি। দুই পর্যায়ে মোট ২৩৪টি অ্যাম্বুলেন্স কেনার জন্য ব্রিটিশ আর্থিক সংস্থা ডি এফ আই ডি-র কাছ থেকে ১২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বুনিয়াদি স্বাস্থ্য প্রকল্প গড়ে তোলার জন্য জার্মান ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্কের সাথে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা

১০ শতাংশের নীচে নিয়ে আসা। ফোকাস-৩ হচ্ছে, পোলিও, কালাজ্বর ও কুষ্ঠ নির্মূল করা, ছোঁয়াচে রোগের প্রকোপ কমানো—ম্যালেরিয়া, যক্ষা, ডেঙ্গি, ডায়ারিয়া ও হামের দরুণ মৃত্যু ৫০ শতাংশ কমিয়ে আনা। ফোকাস-৪ হচ্ছে, বাছাই করা কয়েকটি ছোঁয়াচে নয় এমন রোগের নিরোধক ও নিরাময়কারী পরিষেবাকে জোরদার করা। ফোকাস-৫ হল, শহুরে ও আধা-শহুরে এবং ও অনুন্নত এলাকার গরিবদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা মজবুত করা। ফোকাস-৬ হল, বর্তমান সম্পদগুলির পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার এবং রাজ্য সরকারের ওপর আর্থিক চাপ কমাতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার উদ্ভাবনী উপায় খুঁজে বের করা। ফোকাস-৭ করা হয়েছে, চিকিৎসা শাস্ত্রে শিক্ষার ব্যবস্থা ও গবেষণার উন্নতি। ফোকাস-৮ রাখা হয়েছে, আয়ুষ প্রকল্পকে প্রসারিত করা ও এইডস্ বিরোধী উদ্যোগগুলিকে সমন্বিত করা। ফোকাস-৯ হল, সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের দায়বদ্ধতা বাড়ানো, সর্বসাধারণের অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং রোগী সহায়ক, দ্রুত ও সংবেদনশীল পরিষেবা লাগু করা ও তা চালু রাখা। শেষ ও ১০ নম্বর ফোকাসটা হল, চিকিৎসার সাথে যুক্ত মানবসম্পদের বিকাশ।

শুনতে ভাল এইসব লক্ষ্যগুলোর মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ৬ নং ফোকাসটি। এবং তা অর্জনের জন্য যে প্রেসক্রিপশন স্বাস্থ্যমন্ত্রী থেকে থেকেই উচ্চারণ করছেন তা হল পি পি পি-র দাওয়াই। চুক্তির ভিত্তিতে চিকিৎসক নিয়োগ বাম সরকারই শুরু করে গিয়েছিল। নতুন সরকার সেটাকেই সাধারণ নিয়ম করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে। আর্থিক সংকটের দোহাই দিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার ঢালাও বেসরকারিকরণের নীল নক্শা ছকা হচ্ছে। ততদিনে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থাটার অন্তর্জলী যাত্রা অনেকখানিই হয়ত ত্বরান্বিত হয়ে যাবে।

- সুকান্ত মণ্ডল

"আজকের দেশব্রতী" সম্পাদকমণ্ডলী

অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল, অতনু চক্রবর্তী
জয়দীপ মিত্র, অমিত দাশগুপ্ত

অতিথি কলম

রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে অর্ডিনান্স কেন?

অর্ডিনান্স কেন?

মোটামুটি একই ধাঁচে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য একটি অর্ডিনান্স জারি করেছে রাজ্য সরকার। বিধানসভা অধিবেশনের অল্প আগে অর্ডিনান্স জারির অর্থ বিধিবদ্ধ সমালোচনা ও বিরোধিতা এড়িয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপ। যতদূর বোঝা যায়, সি পি আই (এম) আমলের পুতুল উপাচার্যদের সরানোর জন্য এই তড়িঘড়ি। তবু, কারণ যাই হোক, বিধানসভাকে এড়িয়ে অর্ডিনান্স জারি একটি অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ।

উপাচার্যের সম্মান কমলো

অর্ডিনান্সের প্রথম মাথাব্যাথা অনুসন্ধান কমিটি মারফৎ উপাচার্য বাছাই। তিন জনের কমিটিতে আচার্য ও ইউ জি সি-র সভাপতি মনোনীত সদস্য, এরা দু'জন থাকার ফলে কেন্দ্রের প্রতিনিধিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রের এই গুরুত্ব স্বাস্থ্যকর নয়। ইউ জি সি-র গুরুত্ব যেখানে কেন্দ্রেই সচেতনভাবে কমানো হচ্ছে, সেখানে তার প্রতিনিধি রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে অপ্রয়োজনীয়।

উপাচার্য কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন না। শুনতে ভাল, বিশেষত গত ৩৪ বছরে বহু উপাচার্যের নির্লজ্জ দলবাজির পর। কিন্তু একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে 'যুক্ত থাকা' সম্পর্কে এক এক জনের বিচার এক এক রকম হতে পারে। এখানে সিদ্ধান্ত নেবেন চ্যান্সেলর, আচার্য। তিনি তো অবশ্যই রাজনৈতিক লোক হবেন। এবার তাঁর রাজনীতির ওপর নির্ভর করবে তিনি 'ওয়েবকুটা'য় থাকাকে রাজনৈতিক যোগ মনে করবেন, না আর এস এস-এর 'শাখা'য় যাওয়াকে, 'টাসাম'-এর সভ্য হওয়াকে, না কংগ্রেস বা টি এম সি-র 'সংখ্যালঘু সেল'-এর। না এ ধরনের যা কিছুকেই তিনি রাজনৈতিক বলে ধরবেন।

তারপর, কেবল আচার্যের মতে উপাচার্য বরখাস্ত হবেন এতে উপাচার্যের সম্মান যতটা ক্ষুণ্ণ

কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধি নেই। সিনেটে আছেন বিভাগীয় প্রধানরা। এছাড়া সিনেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোনও শিক্ষকও নেই। আছেন প্রাক-স্নাতক পঠন সংক্রান্ত সাতটি পরিষদের সদস্যদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত পাঁচজন প্রতিনিধি। প্রাক-স্নাতক কলেজ শিক্ষকদের এটুকুই উপস্থিতি। পরিষদগুলো কীভাবে গঠিত হবে সে বিষয়ে কিছু বলা নেই। এছাড়া সিনেটে আছেন আরও ৩৫ জন সদস্য, অধিকাংশই আমলা বা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসক বা কলেজ অধ্যক্ষ, সকলেই মনোনীত। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষাকর্মীদের কোনও চিহ্ন নেই। সিণ্ডিকেটও তথৈবচ। খালি সব বিভাগীয় প্রধানের বদলে তিনজন, ঘুরে ঘুরে এবং তিনজন সহযোগী অধ্যাপক, ঘুরে ঘুরে। পরিষদগুলো থেকে পাঁচজন। এছাড়া আরও ২৩ জন সদস্য, প্রধানত আমলা, প্রশাসক, অধ্যক্ষ, সকলেই মনোনীত।

সি পি আই (এম) বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য স্নাতক ও ছাত্রছাত্রী এবং বিপুল সংখ্যক কলেজ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সরাসরি ভোটে সেনেটে বেশ কিছু আসন অধিকার করত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষকের ভোটে (মানে কেবল সেই বিভাগের শিক্ষকদের ভোটে নয়) বিভাগীয় প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি নানা কায়দায়, চূড়ান্ত গণতন্ত্রের নামে এক দলতন্ত্র চালু করেছিল, যে ব্যবস্থায় সংগঠিত রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ছাড়া অন্য কেউ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করতে পারত না। সেই ব্যবস্থার বদলে মনোনীত আমলা ও পদাধিকারীদের দিয়ে পরিচালনা বেশী গণতান্ত্রিক এই দাবির অসারত্ব বুঝতে একটা প্রশ্নের উত্তরই যথেষ্ট ঃ এই আইন সি পি আই (এম)-এর হাতে

প্রতিটি আইনই যেন কোনও কর্পোরেট সংস্থার কাঠামো ও নিয়মাবলী সংক্রান্ত পোর্টফোলিও থেকে বার হচ্ছে।

সিনেট, সিণ্ডিকেট আসলে অপ্রয়োজনীয়

আসলে এই সিনেট, সিণ্ডিকেট একেবারে অপ্রয়োজনীয় অলংকার। পঠন-পাঠন হয় কিভাবে। বেতন ছাড়া আর সব প্রয়োজনীয় আর্থিক লেনদেনের সিদ্ধান্ত কার্যত হয় বিভাগে। শিক্ষক বাছাই বাইরের বিশেষজ্ঞের উপস্থিতিতে বিভাগেই সব চেয়ে ভাল হয়।

বহু শতাব্দী আগে পশ্চিমে উচ্চ শিক্ষা ছিল চার্চের যাজকদের নিয়ন্ত্রণে। রেনেসাঁসের সময় থেকে পুঁজি উচ্চ শিক্ষাকে নিজেদের সামাজিক নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে চায়। তখন এই প্রচেষ্টা ছিল প্রগতির লক্ষণ। সেই মতো উপাচার্য, সিনেট (নিয়ম তৈরি), সিণ্ডিকেট (প্রয়োগ) কাঠামোগুলো তৈরি হয়। আমরা এগুলোকে পাই ঔপনিবেশিক শাসনের উত্তরাধিকার সূত্রে, ভারতীয়দের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ জারির বৃটিশ মতলব অনুসারে। কিন্তু অতীতের পশ্চিমী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ধ অনুকরণে আজও আমরা সেই মাথাভারী প্রশাসন ও কেরাণীকুল নিয়ে চলছি, যেখানে আধুনিক পশ্চিমী বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যকরী ক্ষমতা চলে গেছে বিভাগগুলোতে।

পূর্বতন বা বর্তমান কোনও আইনই সমর্থনযোগ্য নয়। প্রথমটিতে চতুরভাবে নির্বাচনকে ব্যবহার করা হয়েছে দলতন্ত্র কায়েম করার জন্য। দ্বিতীয়টিতে আমলা ও বিভিন্ন সরকারি পরিষদের (মনোনীত) কর্তাদের মনোনয়ন মারফত সরকার ও তার ফলে সেই দলেরই নিয়ন্ত্রণ কায়েম হবে। এই বাতাবরণে সিনেট, সিণ্ডিকেটের মতো পঠন-পাঠনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কহীন সভা তুলে

আসবেন শিক্ষকদের সঙ্গে নীতি নির্ধারণে।

খেটে খাওয়া মানুষের মত

কেউ জানতে চাইছে কি?

বলা বাহুল্য, এই বিতর্ক পুঁজির ভেতরকার। পুঁজির জন্য যেরকম ও যত পরিমাণে উচ্চশিক্ষিত মানবপণ্য দরকার, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত কিভাবে হবে, প্রশ্নটা তার। শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে পুঁজিপতিদের ঠিক ঠিক সংখ্যায় ও মান-এর আট ক্লাস পাশ মজুর আর বি টেক পাশ ইঞ্জিনিয়ার চাই কারখানার জন্য, পাশ কোর্সে স্নাতক কেরানি চাই অফিসের জন্য, ব্যবসা ও ব্যাঙ্ক চালাবার জন্য সাধারণ ও চার্টার্ড হিসাবরক্ষক। ডাক্তার, অর্থনীতিবিদ ও পদার্থ বিজ্ঞানী সবারই দরকার আছে, ঠিক ঠিক মান ও সংখ্যায়। এমনকি শাসন চালানোর জন্য প্রাচীন রোমের দাসপ্রভুদের আবিষ্কৃত "মানুষকে দাও পাঁউরুটি ও সার্কাস" সূত্রকে মানলে নারায়ণমূর্তি (ইনফোসিস) ও টাটার আদর্শ সমাজে চিত্রকর, কবি, অভিনেতা, গায়কদেরও স্থান আছে। আর, এক পুরুষ থেকে পরের পুরুষে ঠিক ঠিক মান ও সংখ্যায় মানব সম্পদের পুনরুৎপাদনের জন্য চাই সাম্মানিক স্নাতক বা স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষিকা। উচ্চ শিক্ষার উন্নতি মানে আরও ভাল করে নারায়ণমূর্তি ও টাটাদের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন মেধার ও বিভিন্ন পেশার জন্য উপযুক্ত লোক বাছাই করা ও অনুশীলন দেওয়ার কাজের নিষ্পত্তিকরণ।

উচ্চ শিক্ষায় সাধারণ মানুষের স্বার্থ কি ও কোথায় এ বিষয়ে মত নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্ত্ব, চিন্তার প্রস্তুতি ও অবসর এই মুহূর্তে তাঁদের নেই বলেই মনে হয়। তাঁরা এও জানেন যে, উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের মত কেউ জানতে চায় না। শ্রমিক-কৃষক কেমন উচ্চ শিক্ষা চান, কেন চান, আদৌ এই উচ্চ শিক্ষা চান কি? জিজ্ঞাসা করে দেখুন না। তবে তো বিকল্প নিয়ে ভাবনা সঠিক দিশা ধরে চলতে পারবে। ইতিমধ্যে পঠন-পাঠনের

না এ ধরনের যা কিছুকেই তিনি রাজনৈতিক বলে ধরবেন।

তারপর, কেবল আচার্যের মতে উপাচার্য বরখাস্ত হবেন এতে উপাচার্যের সম্মান যতটা ক্ষুণ্ণ হল আর আচার্যের ক্ষমতা যতটা বাড়ল তাতে উপাচার্যের স্বাধীনভাবে এবং সরকারের রাজনীতিকে উপেক্ষা করে কাজ করা অস্বস্তিজনক হয়ে উঠতে বাধ্য।

নির্বাচন পাল্টে মনোনয়ন ঃ সেই দলতন্ত্র

সিনেট, সিণ্ডিকেটে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পরিত না। সেই ব্যবস্থার বদলে মনোনীত আমলা ও পদাধিকারীদের দিয়ে পরিচালনা বেশী গণতান্ত্রিক এই দাবির অসারত্ব বুঝতে একটা প্রশ্নের উত্তরই যথেষ্ট ঃ এই আইন সি পি আই (এম)-এর হাতে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা কুক্ষিগত করতে তাদের কোনও অসুবিধা হত কি?

নির্বাচিত হলেও সমস্যা, মনোনীত হলেও। এই আইনটি (অথবা আগেকার আইনগুলো) পড়লে মনেই হবে না উদ্দেশ্য শিক্ষার উন্নতি। পঠন-পাঠনের সমস্যা নিয়ে একটি বাক্যও নেই। (মনোনীত) কর্তাদের মনোনয়ন মারফত সরকার ও তার ফলে সেই দলেরই নিয়ন্ত্রণ কায়েম হবে। এই বাতাবরণে সিনেট, সিণ্ডিকেটের মতো পঠন-পাঠনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কহীন সভা তুলে দিলেই মঙ্গল। প্রায় কলকাতা পৌর নিগমের মতো উপাচার্য ও প্রতি বিভাগের প্রধান এবং বিভাগ থেকে নির্বাচিত আর একজন করে শিক্ষককে নিয়ে একটি পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন চালানোর পক্ষে যথেষ্ট। এছাড়া থাকবে বিভাগীয় কমিটি। এইখানে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিনিধিরা ও শিক্ষাকর্মীরা না। শ্রমিক-কৃষক কেমন উচ্চ শিক্ষা চান, কেন চান, আদৌ এই উচ্চ শিক্ষা চান কি? জিজ্ঞাসা করে দেখুন না। তবে তো বিকল্প নিয়ে ভাবনা সঠিক দিশা ধরে চলতে পারবে। ইতিমধ্যে পঠন-পাঠনের বিভাগীয় ব্যবস্থা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় আইন থেকে আর সব উঠিয়ে দিলে আমলাতান্ত্রিক বা দলতন্ত্রী ক্ষতিও কম হবে, সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের পয়সাও বাঁচবে। সেইভাবে অর্ডিনান্সের খোল নলচে পাল্টানোই কাম্য।

- দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী

সি টি সি সহ রাজ্য সরকারি পরিবহন কর্মীদের সময়মত বেতন, বোনাস, ডিএ, গ্র্যাচুইটি ও পেনশন প্রদানের দাবিতে সোচ্চার হোন

'মা-মাটি-মানুষ'-এর সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ২৪ নভেম্বর ২০১১ দিনটি ছিল পশ্চিমবঙ্গে প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিবাদের দিন। রাজ্য সরকারের শ্রমিক বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সরকারি পরিবহন কর্মীদের বিশেষত ট্রাম কোম্পানীর শ্রমিক-কর্মচারীদের যোগ্য প্রত্যুত্তর। এ আই সি সি টি ইউ অন্তর্ভুক্ত সি টি সি বি ডি কে এস, সি এস টি সি এস এস কে ইউ এবং এ ডব্লিউ বি এস টি এস এস কে ইউ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আন্দোলন শুরু হলেও পরিশেষে দলমত নির্বিশেষে কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও ও রাজপথ অবরোধের মধ্য দিয়ে শত শত শ্রমিকরা ঘোষণা করেছিলেন "বেতন, বোনাস, ডিএ, গ্র্যাচুইটি, পেনশন আমার অধিকার, এ অধিকার কেড়ে নিতে দেবো না"। এই সকল লড়াকু শ্রমিকদের আমরা সেলাম জানাচ্ছি।

ইতিমধ্যে ২৫ নভেম্বর ২০১১, সি এস টি সি-র সদর দপ্তরের সামনে পাঁচটি সংস্থার কর্মচারীদের সভায় এ আই সি সি টি ইউ সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করেছেন।

পরিবহন মন্ত্রীকে স্মারকলিপি

রাজ্য সরকারি পরিবহন কর্মীদের বেতন, বোনাস, ডিএ, গ্র্যাচুইটি, পেনশন প্রদানেঅনিশ্চয়তা কাটাতে হস্তক্ষেপের আবেদন করে শ্রমমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসুকে দেওয়া স্মারকলিপিতে বলা হয়—

আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে রাজ্য সরকারি পরিবহন শিল্পের প্রায় ২০ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী সময়মত বেতন, বোনাস, ডিএ, পাচ্ছেন না। সহস্রাধিক শ্রমিক-কর্মচারী অবসর নেওয়ার পরও গ্র্যাচুইটির টাকা পাননি। প্রায় ছ-হাজার অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী চার মাস যাবত পেনশন পাচ্ছেন না। সরকারি ভর্তুকি তুলে দেওয়া এবং সরকারি আমলা ও কর্তৃপক্ষের দুর্নীতির কারণে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের চর্চা চলছে। ইতিমধ্যে প্রতিটি ডিপোর বাস ও ট্রামের সংখ্যা ব্যাপকহারে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় পরিবহন কর্মীদের পরিবারের প্রায় লক্ষাধিক মানুষ এক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

পরিবহন শিল্পের কর্মীদের অধিকারকে সুরক্ষিত করতে হস্তক্ষেপ করুন। আশাকরি, অবিলম্বে যাতে পরিবহন কর্মীরা তাঁদের বেতন, বোনাস, ডিএ, গ্র্যাচুইটি ও পেনশন সময়মত পান তার জন্য উপযুক্ত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

দু-মাস অতিক্রান্ত হতে চলেছে, রাজ্য সরকারি পরিবহনের প্রায় ২০ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী তাঁদের বেতন পাচ্ছেন না। বকেয়া ডিএ, বোনাস কবে দেওয়া হবে তা আজও ঘোষণা করা হয়নি। সহস্রাধিক অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা গ্র্যাচুইটি পাননি। ছয় হাজার অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের ছ-মাস যাবত পেনশন বন্ধ। ইতিমধ্যে একজন পরিবহন কর্মী ও একজন পেনশন ভোগী বৃদ্ধা আত্মহত্যা করেছেন। পরিবহন শিল্পের সাথে যুক্ত শ্রমিক পরিবারের প্রায় লক্ষাধিক মানুষ আজ অভুক্ত, অনিশ্চিত, নিরাপত্তাহীন অবস্থার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। কেন এমন হল?

অজুহাত এক—রাজ্য সরকারের হাতে টাকা নেই। পরিবহন শিল্প লোকসানে চলছে। এত শ্রমিকের দায়িত্ব সরকার নিতে পারবে না। সংস্থাগুলোকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। ভর্তুকি বন্ধ করে দেওয়া হবে।

আমরা মনে করি, পরিষেবামূলক সংস্থায় সরকার ভর্তুকি দেয় জনগণের জন্য, শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন বা অন্যান্য সুবিধা দেওয়ার জন্য নয়। দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন প্রভৃতি পরিষেবাগুলোতে ভর্তুকি বন্ধ করে দেওয়ার এবং শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সুপারিশ করে আসছে। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও ভর্তুকি বন্ধ করে দেওয়া ও শ্রমিক ছাঁটাইয়ের চক্রান্ত চলেছিল। একইভাবে আজ আবার এই চক্রান্ত শুরু হয়েছে। শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার সময় রাজ্য সরকারের হাতে অর্থ নেই অথচ এম এল এ-রা দপ্তরে হাজিরা দিলেই তাদের দৈনিক হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হবে বলে এই সরকারই ঘোষণা

সাতের পাতায় দেখুন

খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও সরবরাহ নিয়ে বঞ্চ না-লাঞ্ছনা

পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তিত সরকারের বয়স ছ'মাস পেরিয়ে গেছে। পাঁচ বছরের মেয়াদী কাজের জন্য সাংবিধানিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত একটা সরকারের ছ'মাস সময়টা নিছক শিশুকাল বিবেচ্য হতে পারে না। বিশেষত জনগণের ব্যাপকতম গরিব অংশের জীবন-জীবিকার সমস্যা যেখানে দুর্বিসহ হয়ে উঠছে। এই প্রসঙ্গে অনেকদিক থেকেই সরকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার সময় গড়াচ্ছে। যেমন, ধানের সরকারি ন্যায্যমূল্য পাওয়ার প্রশ্ন, চাষিদের ধানের অভাবী বিক্রী থেকে—ফড়ে আর আড়তদারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার প্রশ্ন, সরকারি গণবণ্টনব্যবস্থায় সরবরাহ সংকোচন ও নিম্নমানের খাদ্যশস্য সরবরাহের সমস্যাদি যথারীতি কেন থাকছে, সেইসব প্রশ্ন। অন্যদিকে, খোলাবাজারে চালের জোগানেরও অভাব নেই, চড়াদামের হ্রাসপ্রাপ্তির কোন লক্ষণও নেই। সার্বিক মূল্যবৃদ্ধি, প্রধানত খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি ও বিশেষত চালের মূল্যবৃদ্ধি এতটুকু কমার কোন দিকই নেই। এইসব প্রশ্ন তো রয়েছেই। গতবছরের মজুত ধান বিক্রী করতে না পেরে চাষি আত্মহত্যা করছে। নতুন জমানায় এরকম সাতজন চাষি আত্মহত্যা করেছে। এমনকি চাষীরা দল বেঁধে পথ অবরোধও করেছে। এসব নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এক অন্যতম সহচর খাদ্যমন্ত্রী অপমানজনক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছেন। সমস্যার সমাধানের মুরোদ নেই, থাকছে যেমন অস্বীকার করার অপপ্রয়াস, সমাধানে সাফল্যের বুলি আউড়ানো, আর নয়তো মর্মান্তিক চাষিমৃত্যুর ঘটনা নিয়ে জমিদারী মেজাজের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ।

গত মরশুমে বোরো ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য না পেয়ে এখনও বহু চাষির ঘরে রয়েছে অবিক্রীত ধান। আশা ছিল নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে নতুন আমন ধান ওঠার আগে ঐ মজুত ধান বিক্রীর সুযোগ-সংস্থান করে দেবে। কিন্তু সরকার সেদিকে তাকায়ইনি। সরকারের নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া চালকল মালিকরা পুরোনো ধানে 'ধূলো বেশী' অজুহাত দেখিয়ে ধান কিনছে না। সরকারও 'অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখা হবে' বলে পাশ সরকারের খাদ্যমন্ত্রকের মধ্যে আঁতাতই ধরা পড়ছে। সরকারও চালকল মালিকদের মারফত পুরোনো বোরো ধানের অভাবী বিক্রীর ফায়দা লুটে সুলভে রেশনে খাদ্যশস্য সরবরাহের 'দাতা সরকার' সাজতে চায়।

নতুন তৃণমূল কংগ্রেস জোট সরকারের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ হল—বিশেষ করে বি পি এল, অন্নপূর্ণা ও অন্ত্যোদয় কোটায় যত পরিমাণ বরাদ্দ ঘোষণা করছে, তত পরিমাণ সরবরাহ করছে না; আর যা চাল সরবরাহ করছে তা এতই নিম্নমানের যে অখাদ্য। কিন্তু রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী এই অপ্রিয় সত্য স্বীকার করছেন না। প্রসঙ্গত, সরকার ও রেশন ডিলারদের মধ্যে সংঘাতও কিছু কিছু দানা বাঁধছে। ডিলাররা এরকম পরিস্থিতি চললে, গ্রাহকদের দ্বারা নাজেহাল হওয়ার অবস্থা চললে, লাইসেন্স জমা দিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। পক্ষান্তরে সরকারও ডিলারদের তৈরী ভুয়ো রেশন কার্ডের মৌচাকে ঘা পড়ার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সবকিছু সরকারের বিরুদ্ধে তাদের অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। ডিলাররা সব 'সাধু' এমনটা নয়। কিন্তু রেশন ব্যবস্থায় খাদ্যশস্য সরবরাহকে কেন্দ্র করে তৃণমূল সরকারের মিথ্যাচার বা অর্ধসত্য প্রচারও প্রকট হচ্ছে। সব জেলার অবস্থা নিয়ে আলোচনা না হয় তোলা থাক। নজীর হিসেবে জঙ্গলমহলের পরিস্থিতিই বিচার করা যাক। সেখানে সরকার দাবি করছে ব্যাপকভাবে বি পি এল, অন্নপূর্ণা ও অন্ত্যোদয় প্রকল্পে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। খাদ্যমন্ত্রী খোদ নিজে সেখানে উপস্থিত থেকে নজরদারি রিপোর্টে সাফল্য দাবি করেছেন। তাঁর মতে ঘোষণার পর থেকে তা কখনও বন্ধ বা ছ'মাস অন্নপূর্ণার চাল না পেয়ে খাদ্যমন্ত্রীর গাড়ি আটকানোর খবরও ছিল। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় সরকারের বি পি এল কার্ড বিলির ঘোষিত লক্ষ্য যেখানে ৫ লক্ষ ৮০ হাজার, সেখানে কার্ড পেয়েছেন এখনও ১ লক্ষ ৫ হাজার। তাহলে 'ব্যাপক সাফল্য' পাওয়ার সরকারি প্রচারটি দাঁড়াচ্ছে মিথ্যাচার বা অর্ধসত্য নয় কি? জঙ্গলমহলে মমতা সরকার এখন চালাচ্ছে সর্বাত্মক যৌথ অভিযান! গণবণ্টনব্যবস্থা নিয়ে বিশেষ 'মমতা' দেখানোর মাথাব্যাথা নেই। অবশ্য 'উন্নয়নের' প্যাকেজ ঘোষণা ও 'সাফল্যের' রেকর্ড বাজানো চলছে বিরামহীন।

চাষিদের ধান বিক্রীর ন্যায্য সহায়ক মূল্য পাওয়া নিয়েও মাথায় হাত। যেটা ততো গুরুত্বপূর্ণ নয়, সেটা নিয়ে সরকার গলাবাজী বেশী করছে। ফাটকা কারবার বন্ধ করার নামে কেন্দ্রের নির্দেশিকা অনুসারে ধানের বিক্রয়মূল্য নগদে ও চেকে দেওয়ার উর্ধসীমা নির্ধারাণ নিয়ে বেশী বেশী বলা হচ্ছে। কিন্তু ন্যায্য মূল্যের প্রশ্নে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই প্রায় কলা দেখানোই হচ্ছে। সেটা সবচেয়ে গুরুতর বিষয় সেটা নিয়েই ঠকবাজী চলছে। সরকার সরু ও মোটা ধানের কেজি প্রতি সহায়ক মূল্য ঘোষণা করেছে ১১.১০ টাকা ও ১০.৮০ টাকা মাত্র। ৬০ কেজির বস্তা প্রতি সরকারি সংগ্রহ মূল্য ৬৫০ টাকার যথাক্রমে সামান্য ওপরে ও নিচে। সম পরিমাণ ধানের উৎপাদন খরচ ৪৫০ টাকার মতন। এর সাথে আছে সরকার নির্দিষ্ট চালকলে ধান বহন করে নিয়ে যাওয়ার পরিবহন খরচ ও মজুর খরচ। গড়ে তা ২০০ টাকার কম খরচ হওয়ার নয়। তাই সরকার ঘোষিত সহায়ক মূল্যের মধ্যে ন্যায্যতা সংগ্রহ অভিযানে নামার কথা ঘোষণা করে। কিন্তু সংগ্রহের একমাত্র ক্ষমতা দেয় স্রেফ চালকলগুলোকে, বেনফেড, কনফেড, ই সি এস সি কে চাল সংগ্রহ থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়। আর চালকলগুলোও চাল কিনতে দেদার দীর্ঘসূত্রীতা চালিয়ে এসেছে অভাবী বিক্রীর পরিস্থিতিকে চরমে নিয়ে যেতে। এসবের যোগফলে ন্যায্য সহায়ক মূল্যের অভাবে অবিক্রীত মজুত ধান এখন গ্রামবাংলার প্রায় প্রতিটি জেলা ও ব্লকেই। এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পরিণামে যখন কৃষক আত্মহত্যা করছে, কৃষকরা অবরোধ আন্দোলনে সামিল হচ্ছে, ধানের ন্যায্যমূল্যে সরকারের ঘরে বিক্রীর দাবিতে গ্রামবাংলায় যখন আবার অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছে; তখন খাদ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন ডিসেম্বর মাস থেকে পুরোদমে ধান কেনা হবে, তার জন্য পাঁচ-দশ কিমি অন্তর শিবির খোলা হবে। দেখা যাবে সরকারের ন্যায্য মূল্যে ধান কেনার বহর কতটা।

মমতা সরকার কেন্দ্রের মনমোহন সরকারের অনুসৃত পথের মতই রাজ্যে নয়া উদারনীতির পথের অনুগামী। অতএব 'সহায়ক মূল্য'-'ভর্তুকি' ইত্যাদি আবশ্যিকতাগুলোকে এই সরকার অগ্রাধিকার দিতে চাইছে কৃষক বা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে নয় (লক্ষ্যণীয় যেমন চাষিদের সহায়ক মূল্য, তেমনি পরিবহন শ্রমিকদের ভর্তুকি পাওয়ার ক্ষেত্রে নয়), সরকারের 'জনকল্যাণকরণের' অ্যাজেণ্ডায় অগ্রাধিকার পাচ্ছে দেশী-বিদেশী পুঁজি লগ্নীকারীশ্রেণীর জন্য পরিকাঠামো নির্মাণক্ষেত্র। তাই নয়া উদারনীতির অনিবার্য নিয়মেই চাষির ধানের ন্যায্যমূল্যের দাবি বারবার মার খাচ্ছে। বামফ্রন্ট আমলেও এটা ঘটেছে। নয়া তৃণমূল কংগ্রেস জোটের আমলেও এটা ঘটতে শুরু করেছে। জোটের এক নম্বর শরিক তৃণমূল নির্বিকার। কংগ্রেস পথে নেমেছে একদিকে নিজেকে বহিরঙ্গে 'কৃষক দরদী' দেখাতে, অন্যদিকে সম্ভবত তৃণমূলের দ্বারা ছলে-বলে-কৌশলে নিজের চাষি ভোটব্যাঙ্ক হাতছাড়া হওয়া ঠেকাতে। কংগ্রেস

সেদিকে তাকায়হীন। সরকারের নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া চালকল মালিকরা পুরোনো ধানে 'ধূলো বেশী' অজুহাত দেখিয়ে ধান কিনছে না। সরকারও 'অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখা হবে' বলে পাশ কাটিয়ে চলছে। চালকল মালিকদের উদ্দেশ্য হল আরও অভাবী বিক্রী করতে বাধ্য করতে দীর্ঘসূত্রীতা চালানো। আর সরকারও চুপচাপ। তাহলে সরকারই কি অভাবী বিক্রীর চূড়ান্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে ইন্ধন জোগাচ্ছে না! তলিয়ে দেখলে সরকারের উদ্দেশ্যও সেটাই। চালকল মালিকশ্রেণী আর অন্নপূর্ণা ও অন্ত্যোদয় প্রকল্পে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। খাদ্যমন্ত্রী খোদ নিজে সেখানে উপস্থিত থেকে নজরদারি রিপোর্টে সাফল্য দাবি করেছেন। তাঁর মতে ঘোষণার পর থেকে তা কখনও বন্ধ বা অনিয়মিত হয়নি। অথচ রাজ্য সরকারের আস্থাভাজন ও গুণকীর্তন করে চলা বাজারী সংবাদপত্রের খবরেও (নিশ্চয় বেফাঁস হয়ে) প্রকাশ যে, নভেম্বর মাসের প্রথম তিন সপ্তাহে সরকার বি পি এল কোটার চাল সরবরাহ করেনি। অন্নপূর্ণা ও অন্ত্যোদয় প্রকল্পের খাদ্যশস্যও অত্যন্ত অপ্রতুল। এর সাথে আছে সরকার নির্দিষ্ট চালকলে ধান বহন করে নিয়ে যাওয়ার পরিবহন খরচ ও মজুর খরচ। গড়ে তা ২০০ টাকার কম খরচ হওয়ার নয়। তাই সরকার ঘোষিত সহায়ক মূল্যের মধ্যে ন্যায্যতা থাকছে কৈ? ন্যায্যমূল্যে ধান কেনার আত্মপ্রচারই চালানো হচ্ছে। বাস্তবে এই সরকার চাষিদের ন্যায্যমূল্যের দাবির পাশে নেই, থাকছে না।

ধান কেনার সময়পর্ব নিয়েও তৃণমূল কংগ্রেস জোট সরকার টালবাহানা চালিয়ে যাচ্ছে। এবছর আগস্ট মাস থেকে সরকার সহায়ক মূল্য সহ চাল তৃণমূল নির্বিকার। কংগ্রেস পথে নেমেছে একদিকে নিজেকে বহিরঙ্গে 'কৃষক দরদী' দেখাতে, অন্যদিকে সম্ভবত তৃণমূলের দ্বারা ছলে-বলে-কৌশলে নিজের চাষি ভোটব্যাঙ্ক হাতছাড়া হওয়া ঠেকাতে। কংগ্রেস একথা বলেই পথে নামছে যে জোট সরকারকে বিব্রত করার কোন ইচ্ছাই তাদের 'আন্দোলনে' নেই। অর্থাৎ জোট সরকারের দুই কংগ্রেসী শরিক—তৃণমূল আর মূল চালাচ্ছে চাষিদের প্রতি বঞ্চনা আর ছলনার আঁতাত।

- অনিমেষ চক্রবর্তী

... বিদেশি বিনিয়োগ বাতিল কর!

একের পাতার পর

মধ্যে মাত্র ২ শতাংশ সংগঠিত ক্ষেত্রে। বস্তুত ৯৫ শতাংশ দোকানই ৫০০ বর্গ ফুট বা তার কম জায়গায় ব্যবসা চালাচ্ছে। দেশের প্রায় ৪ কোটি মানুষ খুচরো ব্যবসা থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। এইসব দোকানগুলো বিরাট আকারে পরিবারের শ্রমের ওপর নির্ভর করে এবং তাদের নিয়োগ করা সম্মিলিত পুঁজির মোট পরিমাণ অত্যন্ত নগন্য, মাত্র ২৬,৬০০ কোটি টাকা। প্রতিটি দোকানে গড়ে মাত্র দেড় জন করে বাইরের কর্মী নিয়োগ করা হয়। সুতরাং বিপুল সংখ্যক পারিবারিক শ্রম এবং অত্যন্ত দুর্বল পুঁজির ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে দেশের অসংগঠিত খুচরো ব্যবসা ক্ষেত্রটি। আবার দেশের মানুষদের মাথাপিছু মাসিক গড় খরচের পরিমাণও খুবই কম। তারা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনে মূলত অসংগঠিত ক্ষেত্রের খুচরো দোকানদারদের কাছ থেকেই।

এহেন দুর্বল ক্রয়ক্ষমতা সম্পন্ন ক্রেতাদের উন্নত পরিষেবা দেওয়া ও মধ্যবর্তী দালাল হটানোর নামে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি দেশি বড় শিল্পগোষ্ঠী সংগঠিত খুচরো ব্যবসায় রমরমিয়ে নেমে পড়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে, আর পি জি গোষ্ঠী, প্যান্টালুন রিটেল, ওয়াদিয়া গোষ্ঠী, রাহেজা গোষ্ঠী, আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠী, মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স গোষ্ঠী ইত্যাদি। এদের মধ্যে রিলায়েন্স আবার খাদ্যপণ্যের ব্যবসার ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র ভূমিকা নিয়ে নিয়েছে। এরা খাদ্যপণ্যের বাজারে সরাসরি নেমে পড়েছে এবং গত বছর পাঞ্জাবে ও মধ্যপ্রদেশে বেশ ভাল পরিমাণ গম কিনেছে। তার পর থেকেই তারা দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ফলমূল ও শাকসব্জী বিক্রির একটা চেইন স্থাপন করেছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে "রিলায়েন্স ফ্রেশ"। দেশের ২০টি রাজ্যে তারা ইতিমধ্যেই ১৫০টি স্টোর খুলেছে এবং শুধুমাত্র মুম্বইতেই আরও ১০০টি স্টোর খুলবে। রিলায়েন্স ফ্রেশের আগ্রাসী কার্যকলাপে বিক্ষুব্ধ হয়ে মধ্যপ্রদেশের ভুপাল ও ইন্দোর, ঝাড়খণ্ডের রাঁচি এবং দিল্লীর ছোট দোকানদার ও সব্জী বিক্রেতারা রিলায়েন্স ফ্রেশের দোকানগুলির ওপর হামলা চালিয়েছে। চেন্নাই ও দেশের অন্যান্য শহরেও চাপা ক্ষোভ দেখা গেছে রিলায়েন্স ফ্রেশের এই সমস্ত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে।

এই পরিস্থিতির ওপর দাঁড়িয়ে এসেছে খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত। এই বিনিয়োগের দিকে পাখির চোখ রয়েছে বিশ্বের সবচাইতে বড় খুচরো ব্যবসা মার্কিন বহুজাতিক গোষ্ঠী "ওয়ালমার্ট"-এর। আরও রয়েছে, ফরাসী বহুজাতিক "কারেফোর" ও জার্মান বহুজাতিক "মেট্রো ক্যাশ অ্যাণ্ড ক্যারি" গোষ্ঠী। ওয়ালমার্ট হিসেব করেছে, ২০১৫ সালের মধ্যে ভারতের খুচরো ব্যবসার ৩৫ শতাংশ আসবে এইসব সংগঠিত রিটেল চেইনগুলো থেকে। তাই গত দু বছর ধরে ওয়ালমার্ট অলক্ষ্যে ভারতে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তারের নীল নক্শা তৈরি করে চলেছে এবং মাল্টি ব্র্যাণ্ডের খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি অনুমোদন হাসিল করার ব্যাপারে তলে তলে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর আমেরিকা সফরের ঠিক পরেপরেই আসা এই সিদ্ধান্ত সেই সন্দেহকে আরও উস্কে দিচ্ছে।

সংসদে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে বিজেপি-সহ প্রায় সবকটি বিরোধী দলই। বিরোধিতা করেছে ইউ পি এ সরকারের শরিক তৃণমূল কংগ্রেস ও ডি এম কে দলও। কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ ভাল করেই জানে যে, তাদের এই বিরোধিতা মোটেই আন্তরিক নয়, লোকদেখানো মাত্র। যে উদার সংস্কার কর্মসূচীর হাত ধরে এই সিদ্ধান্তটি এসেছে, তার সাথে সহমত সবকটি শাসক দলই। অন্যদিকে, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে ব্যবসা বন্ধ-এর ডাক দিয়েছে খুচরো ব্যবসায়ীদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ অল ইণ্ডিয়া ট্রেডার্স এবং ভারত উদ্যোগ ব্যাপার মণ্ডল। ১০ হাজারেরও বেশি সংগঠনের এই বন্ধ-এ সামিল হওয়ার কথা। আসুন, দেশের ছোট ব্যবসায়ী ও চাষিদের ধ্বংসের পরওয়ানা নিয়ে আসা, দুর্বল আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন ক্রেতাদের স্বার্থবিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিকদের পায়ে আত্মসমর্পণ করা এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি তুলে আমরাও সেই তাদের সেই লড়াইয়ের পাশে দাঁড়াই।

কর্পোরেট লুঠ, মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতির পর ইউ পি এ সরকারের নিশানা এবার ক্ষুদ্র ব্যবসা

ইউ পি এ সরকার হুঁশিয়ার! ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিদেশী বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত বাতিল কর!

শোক সংবাদ

চলে গেলেন শৈবাল মিত্র—এক স্বভাব আপনজন

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম এক সেরা ঘটনা হল, ষাটের দশকের মধ্যভাগে নকশালবাড়ীর বিপ্লবী কৃষক অভ্যুত্থান—বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ। বিপ্লবী বামপন্থী আন্দোলন ও ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও পরবর্তীতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথী শৈবাল মিত্র প্রয়াত হলেন। গত ২৭ নভেম্বর রাত্রি ১০.৩০ নাগাদ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি প্রয়াত হলেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী, দুই কন্যা ও অগণিত অনুরাগীকে। বিগত তিন চার মাস যাবৎ তিনি ফুসফুসে সংক্রমণজনিত কারণে ভুগছিলেন। তাঁর হৃদপিণ্ডেরও গোলোযোগ ছিল। প্রায় তিন দশকেরও বেশি তিনি হৃৎপিণ্ডের গোলযোগে অসুস্থ ছিলেন। চার চারবার তাঁর হৃৎপিণ্ডের ভাল্ব অপারেশন হয়েছে। জীবনের বহু যুদ্ধে তিনি জয়ী হয়েছেন, অফুরন্ত জীবনীশক্তি ছিল তাঁর! কিন্তু জীবনের শেষ যুদ্ধে তাঁর জীবনদীপ নিভে গেল।

শৈবাল মিত্র স্কটিশচার্জ কলেজে পড়তেন। ছাত্রজীবনে তিনি ছাত্র ফেডারেশনের নেতা হয়ে উঠেছিলেন। ষাটের দশকে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ছাত্র ফেডারেশনের (বি পি এস এফ) রাজ্য সহ-সভাপতি ও কলকাতা জেলা সভাপতি হয়েছিলেন। বসন্তের বজ্রনির্ঘোষে সাড়া দিয়ে তিনি ছাত্রফ্রন্টে বিপ্লবী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ছাত্রদের সংগঠনের নির্বাচনের সময় তিনি তৎকালীন মার্কসবাদী দলের নেতা প্রমোদ দাশগুপ্তের প্যানেলকে পরাজিত করেছিলেন। ছাত্রফ্রন্টের অফিসেরও দখল নিয়েছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন প্রেসিডেন্সি কনসোলিডেশন। পরবর্তীতে সি পি আই (এম এল) দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। জেলও খেটেছেন। তারপরে অবশ্য মতপার্থক্যের কারণে সি পি আই (এম এল) ধারা সরব হয়েছেন, আন্দোলনে পাশে থেকেছেন। সিওয়ানে বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলনের তথা "আইসা"র নেতা চন্দ্রশেখরকে আর জে ডি-র দাগী সাংসদ সাহাবুদ্দিন গুণ্ডা দিয়ে হত্যা করার প্রতিবাদে কলকাতার স্টুডেন্টস হলে প্রতিবাদসভায় চন্দ্রশেখরের মা কৌশল্যা দেবী, জনসংস্কৃতি পরিষদের সর্বভারতীয় স্তরের নেতা রামজী রাই, প্রয়াত অধ্যাপক জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে শৈবাল মিত্রও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আজিজুল হকের মুক্তির দাবিতে কিংবা কানোরিয়া জুটমিলে শ্রমিকদের লড়াইয়ের সংহতি আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। গোধরাকাণ্ডের প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনকে তিনি সমর্থন জানিয়েছেন। আজকাল পত্রিকায় একসময় তিনি নিয়মিত কলাম লিখতেন। কিন্তু সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঘটনার পর তিনি লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় একদিন এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে শৈবালদা জানালেন, সম্পাদক তাঁর মতামতকে পত্রিকার নিজস্ব ভাবনার সঙ্গে সংপৃক্ত করিয়ে লিখতে বলেছেন বলে তিনি আপোষে রাজি হননি। এর আগে ঐ পত্রিকায় দীর্ঘদিন "রাত্তিরেতে বেজায় রোদ্দুর" শিরোনামে নিয়মিত উত্তর সম্পাদকীয় লিখতেন, যা পাঠকদের কাছে সমাদৃত হয়েছিল। পরিবর্তনের আন্দোলনে তিনি সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও তিনি বলতেন, বাংলার বুকে ৩৪ বছর ধরে জগদ্দল যে পাথরটা চেপে বসে আছে তার অপসারণ ঘটুক।

শৈবাল মিত্র সাহিত্য জগতেও অবাধে বিচরণ করেছেন। ছোট গল্প কিংবা উপন্যাসে তিনি সমসময়ের জলছবি এঁকেছেন। সমসাময়িক রাজনীতি, সমাজজীবন কত সহজেই না প্রতিফলিত হত তাঁর সাহিত্যে। অজ্ঞাতবাস, ধর্মযুদ্ধ, রসাতল,

চির উজ্জ্বল থাকুক কমরেড সুচরিত সেনগুপ্ত'র স্মৃতি

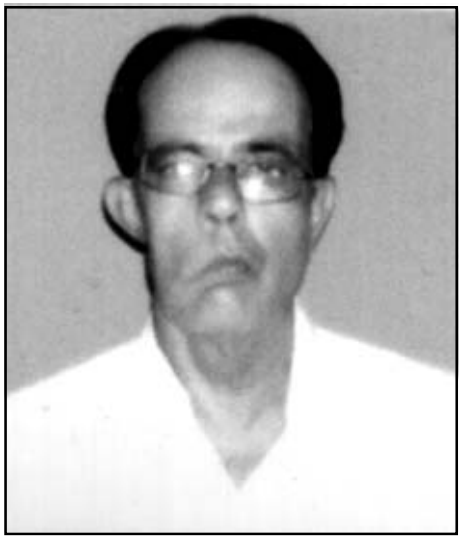

দু-বার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলেও এইবার সত্যিসত্যিই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন সুচরিত সেনগুপ্ত। প্রথমবার ৭০ সালে সি পি এম ঘাতক বাহিনী সদ্য যুবক, বিপ্লবী চিন্তায় উজ্জীবিত সুচরিতদাকে তুলে নিয়ে গিয়ে নির্মম অত্যাচার করে, মরে গিয়েছে ভেবে ফেলে রেখে চলে যায়। পিতা সুধাংশু সেনগুপ্ত খবর পেয়ে ছেলেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে জীবনরক্ষা করেছিলেন। আবার ৭১ সালে গ্রেপ্তার হওয়ার পর কৃষ্ণনগরের পুলিশ রাত ২টোর সময় জলঙ্গী নদীর পাড়ে গাছে বেঁধে গুলি করতে যায়। সেই মুহূর্তে অন্যরকম কোন খবর চলে আসায় শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পান। কিন্তু এইবার দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ নভেম্বর সকাল ৬-২২ মিনিটে মাত্র ৬০ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

প্রয়াত সুধাংশু সেনগুপ্ত ও বেলা সেনগুপ্তের ছয় সন্তানের মধ্যে সবার বড় ছিলেন সুচরিতদা। মা-বাবার আদরের ছেলে ছিল বাবলু। বাবা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, নদীয়া জেলার ধুবুলিয়া উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও ত্রাণ দপ্তরের সুপারিটেনডেন্ট, সরকারি কর্মচারি ইউনিয়নের নেতা। মা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। রাজনৈতিক আবহের মধ্যেই সুচরিত ও তার ভাইবোনেরা বড় হয়ে ওঠেন। ৭০ দশকে উত্তাল নকশালবাড়ীর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন সুচরিতদা। কৃষ্ণনগর কলেজ অফ কমার্স (বর্তমানে ডি এল রায় কলেজ) পড়ার সময় কৃষ্ণনগরে কমরেড পুলক রায়-নাদু চ্যাটার্জীদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনে কমরেড গোরা রায়, শুভ্রাংশু ঘোষ ও বিপ্লব ব্যানার্জীদের (বিলে) সাথে আন্দোলনে সামিল হন। এই কমরেডরা শহীদ হয় যাওয়ার পর ১৯৭১ সালে সুচরিতদা গ্রেপ্তার হয়ে তিন মাস ও স্থায়ীকরণ করতে অস্বীকার করে, এমনকি বরখাস্ত করার চেষ্টা করে। সরকারের বিরুদ্ধে আইনী লড়াই করে তিনি ৯০ সালে স্থায়ী হন এবং ২০১১ সালে মৃত্যুর কিছুদিন আগে হাইকোর্ট তাঁর পক্ষে রায় দেন এবং রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেয় সুচরিতদার সমস্ত ন্যায়সঙ্গত পাওনা মিটিয়ে দিতে। বছরের পর বছর তিনি সরকারের বিরুদ্ধে এই কঠিন লড়াই চালিয়ে গেছেন। গত ৩১ অক্টোবর তিনি চাকরি থেকে অবসর নেন। তিনি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সি পি আই (এম-এল) লিবারেশনের ধুবুলিয়া এরিয়া কমিটির সদস্য ছিলেন।

১৯৯৩ সালে প্রথম তাঁর ক্যানসার অপারেশন হয়। গত ১৫ বছর ধরে সমস্ত রকমের চিকিৎসা সত্ত্বেও অবশেষে তিনি চিরদিনের জন্য চলে গেলেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গিয়েছেন তাঁর স্ত্রী প্রীতি সেনগুপ্ত, কন্যা সায়ন্তনী সহ আত্মীয় পরিজন ও গুণমুগ্ধ অসংখ্য বন্ধুবান্ধব এবং

প্রেসিডেন্সি কনসোলিডেশন। পরবর্তীতে সি পি আই (এম এল) দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। জেলও খেটেছেন। তারপরে অবশ্য মতপার্থক্যের কারণে সি পি আই (এম এল) ধারা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন। সেই সময় নকশালবাড়ি আন্দোলনের ওপর শাসকদলের সর্বাত্মক আক্রমণ নেমে আসে। আন্দোলন ধাক্কা খায়। তারপর শৈবাল মিত্র সি পি আই (এম এল) ধারার পুনরুজ্জীবনের সাথে আর সেভাবে নিজেকে যুক্ত করেননি। তিনি চলে যান অধ্যাপনা ও প্রগতি সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে। অধ্যাপনার সঙ্গে সাবলীল সাহিত্য চর্চা তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত হয়ে উঠলেও তিনি ঘটমান সামাজিক পরিঘটনা থেকে নিজেকে নির্লিপ্ত রাখেননি। বাংলার রাজনীতির বিভিন্ন বাঁকে তিনি কখনও কখনও নিজেকে যুক্ত করেছেন। আর সদা শাণিত করেছেন মসী। সত্তরের দশকে জরুরী অবস্থা অবসানের পর রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। গত শতাব্দীর আটের দশকে তিনি বামফ্রন্ট সরকারের জনবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে নানা লড়াইয়ে পরামর্শ দিয়েছেন, অংশও নিয়েছেন। বিহারে ইণ্ডিয়ান পিপল্‌স ফ্রন্ট, বিহার প্রদেশ কিষাণসভা কিংবা সি পি আই (এম এল)-এর কর্মী-সমর্থক-নেতাদের হত্যার বিরুদ্ধেই হোক কিংবা বিহারে সামন্ত প্রভুদের লেঠেল বাহিনী বা ঘাতকবাহিনী দ্বারা গণহত্যার বিরুদ্ধেই হোক তিনি প্রতিবাদে করেছেন। ছোট গল্প কিংবা উপন্যাসে তিনি সমসময়ের জলছবি এঁকেছেন। সমসাময়িক রাজনীতি, সমাজজীবন কত সহজেই না প্রতিফলিত হত তাঁর সাহিত্যে। অজ্ঞাতবাস, ধর্মযুদ্ধ, রসাতল, অগ্নির উপাখ্যান, যে আগুন খেয়েছিল, জেগে আছে একজন, ঘুম ভাঙানি, পাগলা ঘন্টি, অন্তঃকরণ, উড়ান, যখন নৈঃশব্দ ইত্যাদি পাঠকসমাজে আলোড়ন তুলেছিল। ফায়ারিং স্কোয়াডে ভোর, আতর আলির রাজসজ্জা ছোট গল্পের সংকলন হিসাবে পাঠকদের মনে দাগ কেটেছে। ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলন, বামপন্থার আত্মদর্শন হয়ে ওঠে তাঁর রাজনৈতিক-সামাজিক প্রবন্ধ সংকলন। অনুচ্চ উচ্চারণে তিনি শুভানুধ্যায়ীদের সামনে যে বক্তব্য পেশ করতেন তাতে সকলে মজে যেতেন। কলকাতার কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসের আড্ডাতেই তা জমে উঠত। কফি হাউসের কনজিউমার ফোরামের সম্পাদক ছিলেন প্রায় আমৃত্যু। শৈবালদা ছিলেন স্বভাব আপনজন। তাঁর উপস্থিতিটাই তাঁর নেতৃত্বকে জানান দিত। হৃদয়ের পীড়াতে জেরবার হলেও তাঁর ছিল এক কোমল হৃদয়। জীবনে তিনি কোন পুরস্কার পাননি সরকারি তরফে অথচ তাঁর সাহিত্য প্রতিভা ছিল প্রশ্নাতীত। এমন এক মানবদরদী, মুক্তমনা রাজনীতিক ও সংবেদনশীল সাহিত্যিকের মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর পরিবারকে আমাদের সমবেদনা জানাই।

- নিত্যানন্দ ঘোষ

প্রয়াত কমরেড শঙ্কর দাসের স্মরণে জলপাইগুড়িতে আলোচনা সভা

২৩ নভেম্বর ২০১১ প্রয়াত কমরেড শঙ্কর দাসের স্মরণে জলপাইগুড়ি শহরের কদমতলায় বান্ধব নাট্য সমাজ হলে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াত কমরেড শঙ্কর দাস পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য ও জলপাইগুড়ি জেলার সম্পাদক ছিলেন।

সকালে এ আই সি সি টি ইউ-র অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় মোটর কর্মী ইউনিয়নের গোশালা মোড়ে ইউনিয়নের অফিসের সামনে শঙ্কর দাসের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। কমরেড শঙ্কর দাস ছিলেন ভারতীয় মোটর কর্মী ইউনিয়নের অন্যতম স্থপতি। এ আই সি সি টি ইউ এবং পার্টির রাজ্য ও জেলা নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করেন। উপস্থিত শ্রমিকদের সামনে পরিবহন শ্রমিকদের আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এ আই সি সি টি ইউ-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাসুদেব বসু।

বিকাল ৩টার সময় বান্ধব নাট্য সমাজ হলে কমরেড শঙ্কর দাসের স্মৃতিতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। "বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্মসূচী" শীর্ষক আলোচনা সভায় বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন পার্টির রাজ্য কমিটি সদস্য বাসুদেব বসু, রাজ্য কমিটির সদস্যা গৌরী দে, বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা পুলক গাঙ্গুলী, কলকাতা জেলা কমিটি সদস্য বিভাস বোস, জনপাইগুড়ি জেলা কমিটির সদস্য বিজন সরকার, সুভাষ দত্ত ও পার্টির শুভানুধ্যায়ী প্রদীপ গোস্বামী। সভায় গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন মিহির সেন। সমগ্র সভাটি পরিচালনা করেন পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য ও জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত চক্রবর্তী।

ওঠা আন্দোলনে কমরেড গৌরী রায়, শুভ্রাংশু ঘোষ ও বিপ্লব ব্যানার্জীদের (বিলে) সাথে আন্দোলনে সামিল হন। এই কমরেডরা শহীদ হয় যাওয়ার পর ১৯৭১ সালে সুচরিতদা গ্রেপ্তার হয়ে তিন মাস ও ৭৪ সালে গ্রেপ্তার হয়ে কিছুদিন কারাবন্দী ছিলেন। নদীয়া জেলা তথা ধুবুলিয়ার ৭০ দশকের আন্দোলনে যুক্ত থাকা মুষ্টিমেয় কমরেডদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুচরিতদা। চার দশক ধরে লাগাতার বিপ্লবী পার্টির সাথে যুক্ত থাকার অনন্য ঐতিহ্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন সংস্কৃতিমনস্ক। এলাকার প্রগতি নাট্য উদ্যোগের সাথে তিনি গভীর সম্পর্ক রাখতেন। ধুবুলিয়ার কোন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডই তাঁকে বাদ দিয়ে হয়নি। কৃষ্ণনগরে গণ সংস্কৃতি পরিষদের রাজ্য উৎসবে তিনি ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোক্তা। গত তিন বছর ধরে ধুবুলিয়ার সরকারি কর্মচারিদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তিনি সঙ্গে ছিলেন।

৭০ দশক থেকেই সুচরিতদাদের বাড়ী বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে পড়ে। সুচরিতদার পাশাপাশি মেজ ভাই সুবিমল পার্টির কার্যকলাপে যুক্ত হয়ে পড়েন। তিনি বর্তমান পার্টির নদীয়া জেলা সম্পাদক ও রাজ্য কমিটির সদস্য। গোপন পার্টি কার্যকলাপের সময় পুলিশ-প্রশাসনের হামলা নেমে আসে পরিবারের ওপর। মা বেলা সেনগুপ্ত ক্রমাগত পুলিশী হামলার মধ্যেও বহু কমরেডকে আশ্রয় দিয়েছেন, রক্ষা করেছেন।

৭৪-৭৬ সালে আন্দোলনের ভাটার সময় সুচরিতদা রাজ্য সরকারের দুগ্ধ ও পশুপালন দপ্তরে চাকরী নেন। বামফ্রন্ট সরকার রাজনৈতিক কারণে সত্ত্বেও অবশেষে তিনি চিরদিনের জন্য চলে গেলেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গিয়েছেন তাঁর স্ত্রী প্রীতি সেনগুপ্ত, কন্যা সায়ন্তনী সহ আত্মীয় পরিজন ও গুণমুগ্ধ অসংখ্য বন্ধুবান্ধব এবং কমরেডদের। পরিবারের বিরাট ক্ষতির পাশাপাশি পার্টি হারালো একজন একনিষ্ঠ কমরেডকে, ধুবুলিয়া সংগঠন হারালো এক রাজনৈতিক অভিভাবককে। এ ক্ষতি অপূরণীয়।

কমরেড সুচরিত সেনগুপ্তের মৃত্যু সংবাদ শোনার সাথেসাথেই কমরেডরা হাসপাতালে উপস্থিত হন। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যদান করেন পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য সজল পাল, নদীয়া জেলা কমিটির সম্পাদক সুবিমল সেনগুপ্ত, অমল তরফদার, পশুপতি রায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। হাসপাতাল থেকে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় পার্টির ধুবুলিয়া অফিসে। পার্টি অফিসের পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। সেখানে শায়িত দেহে মাল্যদান করেন ধুবুলিয়া এরিয়া কমিটির সম্পাদক আনছারুল হক, রাজ্য কমিটির সদস্য কৃষ্ণ প্রামাণিক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। তারপরে নবদ্বীপ শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। কমরেড সুচরিত সেনগুপ্ত লাল সেলাম।

- কাজল দত্তগুপ্ত

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি
(মার্কসবাদী লেনিনবাদী) লিবারেশন
নদীয়া জেলা কমিটির পক্ষে

৬ ডিসেম্বর দুপুর ২টায় ধুবুলিয়া মুক্তমঞ্চে
প্রয়াত কমরেড সুচরিত সেনগুপ্তের স্মরণসভা

খুচরো ব্যবসায় বিদেশী বিনিয়োগের বিরুদ্ধে ১ ডিসেম্বর দেশজুড়ে বন্‌ধ সফল করার আহ্বান

সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড পার্থ ঘোষ এক প্রেস বিবৃতি জানান—আর্থিক সংস্কারের নামে বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাগুলো—ওয়ালমার্ট, মেট্রো ক্যাশ এণ্ড ক্যারি, ক্যারিফোর ইত্যাদির মতো বিদেশী হাঙর সংস্থাগুলোকে মাল্টি ব্র্যাণ্ডে ৫১ শতাংশ এবং সিঙ্গল ব্র্যাণ্ডে ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত ভারতের ক্ষুদ্র ব্যবসাকে যেমন বিপন্ন করবে তেমনি ব্যাপক কর্মহীনতার জন্ম দেবে। আমাদের দেশে গড়ে প্রায় ১০০০ জন প্রতি একটি ক্ষুদ্র ব্যবসার দোকান আছে। ১ কোটি ২০ লক্ষের মতো ক্ষুদ্র ব্যবসার সঙ্গে প্রায় ৪ কোটি মানুষের রুটি-রুজি-জীবন ও কর্মসংস্থান জড়িয়ে আছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যুগে যেভাবে ভারতের ব্যবসাকে চরম সর্বনাশের পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হিসাবে দেখা দিয়েছিল, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত উপভোক্তা থেকে শুরু করে ব্যাপক কৃষক সমাজও এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। ইউ পি এ সরকারের এই জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে "কনফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া ট্রেডার্স" ১ ডিসেম্বর খুচরো ও পাইকারী ব্যবসা বন্‌ধের যে ডাক দিয়েছে আমাদের পার্টি তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে এবং ঐ দিন রাজ্যের সমস্ত বাজার-হাট ও ব্যবসাকেন্দ্রগুলোর সামনে প্রচার ও বিক্ষোভ সভা সংগঠিত করবে।

পদোন্নতির প্রহসন খোদ শ্রমমন্ত্রীর দপ্তরে

শ্রমমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসুর দপ্তরের ডাইরেক্টরেট অব্ ফ্যাক্টরিস আধিকারিকদের পদোন্নতি নিয়ে ভয়ঙ্কর অনিয়ম চলছে। কিছু আমলা পদোন্নতি সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম কানুন এমনকি শীর্ষতম আদালতের রায় পদদলিত করে চলেছেন—কিসের স্বার্থে, কার স্বার্থে?

অবসরপ্রাপ্ত চিফ ইনস্‌পেক্টর অব ফ্যাক্টরিস (মুখ্য কারখানা পরিদর্শক) শ্রী রমাপদ চক্রবর্তীকে পুনর্বহাল করা হল এই বছরের ২৫ আগস্ট তারিখের এক নির্দেশনামায় মাত্র চার মাসের জন্য অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত। দপ্তরের আধিকারিকদের মধ্যে প্রশ্ন উঠছে কেন এত স্বল্প সময়ের জন্য অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকের পুনর্নিয়োগ? উচ্চ পর্যায়ের আমলাদের কি যোগ্য ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না? নাকি তাদের কোন

পরবর্তী জয়েন্ট চিফ্ ইনস্পেক্টর পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে তার অগ্রাধিকার থাকবে এবং এই জন্য কমন ক্যাডার তালিকা অনুসরণ করতে হবে।

কিন্তু বর্তমানে চিফ্ ইনস্পেক্টর অব্ ফ্যাক্টরিস পদ থেকে রমাপদ চক্রবর্তীর এই ডিসেম্বর শেষে অবসরের পর কর্তৃপক্ষ যে ব্যক্তিকে চিফ ইনস্পেক্টর পদে উন্নীত করার চক্রান্ত করছেন তা নিয়ম বহির্ভূত। তিনি বর্তমানে রাসায়নিক বিভাগে জয়েন্ট চিফ্ ইনস্পেক্টর। এই আধিকারিকের বামফ্রন্ট জমানায় ডেপুটি চিফ্ ইনস্পেক্টর পদ থেকে জয়েন্ট চিফ্ ইনস্পেক্টর পদে উন্নীত হওয়াটাই ছিল বেআইনি। কারণ তিনি উক্ত পদে ২০০৫ থেকে ২০০৭ সালের সময়কালে মাত্র এক বছর আট মাস কাজ করেছিলেন, তিন বছর ধারাবাহিক কাজ করেননি; তিনি বছর ধারাবাহিক

ঘটনা ও প্রবণতা

নারী-নিগ্রহে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থানে

২০১০ সালের অপরাধমূলক ঘটনার রাজ্যওয়াড়ি খতিয়ান বলছে, মহিলাদের উপর স্বামী ও শ্বশুড়বাড়ির অত্যাচারই হোক বা নারী পাচার, নাবালিকা ধর্ষণ হোক বা দেহ-ব্যবসার জন্য মেয়ে বিক্রি, সব হিসেবেই অধিকাংশ রাজ্যকে পিছনে ফেলে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ।

সারা দেশে অপরাধের খতিয়ান নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের 'ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো'-র ২০১০-এর রিপোর্ট বলছে, সারা দেশে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ১২.২ শতাংশ ঘটনাই ঘটছে পশ্চিমবঙ্গে। অন্ধ্রপ্রদেশের ঠিক পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান। দেশের জনসংখ্যার ৭.৬ শতাংশ মানুষের বাস যেখানে পশ্চিমবঙ্গে, সেখানে তুলনামূলকভাবে এই হিসেবটা যথেষ্টই বেশি। গত বছর পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের ২৬,১২৫টি মামলা পুলিশের খাতায় জমা পড়েছে। এর মধ্যে বেশির ভাগই হল স্বামী ও শ্বশুড়বাড়ির লোকেদের অত্যাচারের ঘটনা। গত বছর সারা দেশে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮-এ ধারায় এই ধরনের অপরাধ ঘটেছে ৯৪,০৪১টি। এর মধ্যে ১৯ শতাংশ ঘটনাই ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গে। জেলাওয়াড়ি হিসেবেও দেশের সব জেলাগুলোর থেকে এগিয়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ।

রাজ্যগুলো থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে আসা হিসেব অনুযায়ী, ধর্ষণের ক্ষেত্রে গোটা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে পশ্চিমবঙ্গ। মধ্যপ্রদেশের ঠিক পরেই। দেশে ২০০৯-এ যেখানে ধর্ষণের ঘটনা ছিল ২১,৩৯৭টি, সেখানে ২০১০-এ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২,১৭২টিতে। এর মধ্যে ১০.৪ শতাংশ বা ২,৩১১টি ঘটনাই ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গে। নাবালিকাদের ভুল বুঝিয়ে যৌন সম্পর্ক তৈরি করার মামলার ক্ষেত্রেও সবথেকে এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গ। ... দেহ ব্যবসায় নামানোর জন্য গত বছর মেয়েদের বেচাকেনার ঘটনা ঘটেছিল ২০৮টি এর মধ্যে ১৬৩টিই পশ্চিমবঙ্গে।

... অপরাধীদের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার রাজ্যে মাত্র ১৩.৫ শতাংশ, যা জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেক কম।

- আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ অক্টোবর ২০১১

সামাজিক সূচকে ভারত প্রতিবেশীদের থেকে পিছিয়ে

		ভারত	বাংলাদেশ	ভুটান	নেপাল	পাকিস্তান	শ্রীলঙ্কা	চীন
গড় আয়ু	১৯৯০	৫৮	৫৪	৫২	৫৪	৬১	৬৯	৬৮
	২০১০	৬৪	৬৭	৬৭	৬৭	৬৭	৭৪	৭৩
শৈশব মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০-এ)	১৯৯০	৮১	৯৯	৯৬	৯৭	৯৬	২৬	৩৮
	২০১০	৪৮	৩৮	৪৪	৪১	৭০	১৪	১৬
৫ বছরের নীচে মৃত্যুর হার (১০০০-এ)	১৯৯০	১১৫	১৪৩	১৩৯	১৪১	১২৪	৩২	৪৮
	২০১০	৬৩	৪৮	৫৬	৫০	৮৭	১৭	১৮
মহিলা প্রতি শিশুর সংখ্যা	১৯৯০	৩.৯	৪.৫	৫.৭	৫.২	৬.০	২.৫	২.৩
	২০১০	২.৭	২.৩	২.৫	২.৮	৩.৫	২.৩	১.৬
পরিচ্ছন্ন পায়খানার সুবিধা (শতাংশে)	১৯৯০	১৮	৩৯	-	১১	২৮	৭০	৪১
	২০১০	৩১	৫৩	৬৫	৩১	৪৫	৯১	৫৫
স্কুল পড়ার গড় সময় (বছরে)	১৯৯০	৩.০	২.৯	-	২.০	২.৩	৬.৯	৪.৯
	২০১০	৪.৪	৪.৮	-	৩.২	৪.৯	৮.২	৭.৬

আধিকারিকদের মধ্যে প্রশ্ন উঠছে কেন এত স্বল্প সময়ের জন্য অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকের পুনর্নিয়োগ? উচ্চ পর্যায়ের আমলাদের কি যোগ্য ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না? নাকি তাদের কোন তোষামোদের আধিকারিককে মুখ্য কারখানা পরিদর্শক পদে নিয়ম বহির্ভূতভাবে উন্নীত করার প্রক্রিয়াকরণের সময় নিচ্ছেন। বিগত বত্রিশ বছর ধরে যে পদ্ধতিতে মুখ্য কারখানা পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়েছিল সেই একই পদ্ধতিতে যোগ্য ব্যক্তিকে পয়লা জুলাই ২০১১ তারিখে এই পদে বসানো হল না কেন—প্রশ্ন থেকে যায়। নিয়মভঙ্গের কথা তুললে আগে জনস্বার্থে জানা দরকার নিয়মটা কি?

ডাইরেক্টরেট অব্ ফ্যাক্টরিস তিনটি ভাগে আছে। প্রথমটি প্রধান বিভাগ, যা সৃষ্ট হয় প্রাক্ স্বাধীনতা আমলে। অপর দুইটি—স্বাস্থ্য বিষয়ক ও রাসায়নিক বিভাগ, যেটি চালু হয় ভূপালের ইউনিয়ন কার্বাইডে ইচ্ছাকৃত গাফিলতিজনিত নারকীয় দুর্ঘটনা কাণ্ডের পর।

এই তিটি উইংসের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল পদ হল চিফ্ ইনস্পেক্টর অব্ ফ্যাক্টরিস (মুখ্য কারখানা পরিদর্শক) যার দায়িত্বে তিনটি বিভাগই আছে। প্রত্যেক বিভাগে পরবর্তী দায়িত্বশীল পদগুলো যথাক্রমে—(১) জয়েন্ট চিফ ইনস্পেক্টর (২) ডেপুটি চিফ্ ইনস্পেক্টর এবং (৩) ইনস্পেক্টর অব্ ফ্যাক্টরিস। ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকেল ৩০৯ ক্ষমতাবলে রাজ্যপাল ঘোষিত শ্রম দপ্তরের প্রকাশিত রিক্রুটমেন্ট (কর্মচারী নিয়োগ) রুলসের নিয়মানুসারে ডেপুটি চিফ্ ইনস্পেক্টর অব্ ফ্যাক্টরিস (কেমিক্যাল) পদে ন্যূনতম তিন বছর কাজ করলে জয়েন্ট চিফ্ ইনস্পেক্টর অব্ ফ্যাক্টরিস (কেমিক্যাল) পদে উন্নীত হতে পারে, অবশ্য অন্যান্য শর্তগুলো ঠিক থাকলে।

পশ্চিমবঙ্গ ফ্যাক্টরিস সার্ভিস বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টে একটি মামলা হয়। সেই মামলায় ডিভিসন বেঞ্চে মাননীয় বিচারপতিদ্বয় রায় দানে পদোন্নতির বিষয়ে নিদেশ দেন—প্রধান বিভাগের ডেপুটি চিফ্ ইনস্পেক্টর যখন কেমিক্যাল উইংয়ের ডেপুটি চিফ্ ইনস্পেক্টরের আগে উক্ত পদে নিয়োজিত হয়েছেন, হওয়াটাই ছিল বেআইনি। কারণ তিনি উক্ত পদে ২০০৫ থেকে ২০০৭ সালের সময়কালে মাত্র এক বছর আট মাস কাজ করেছিলেন, তিন বছর ধারাবাহিক কাজ করেননি; তিনি বছর ধারাবাহিক কাজ করলে তবেই জয়েন্ট চিফ্ ইনস্পেক্টর (কেমিক্যাল) পদে পদোন্নতি হওয়ার কথা। অথচ এই বিভাগের উধর্বতন আমলাদের যুক্তি উনি একদা অস্থায়ী সময়কালের ভিত্তিতে রাসায়নিক বিভাগে ডেপুটি চিফ্ ইনস্পেক্টর হিসাবে কাজ করেছেন, সেই সময়কালকে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভিসেস রুলস ১৯৮১-র নিয়মে বলা হয়েছে, ধারাবাহিক কার্যকালকে বিবেচনায় রাখতে হবে। এই ক্ষেত্রে সাময়িক সময়ের জন্য "বিশেষ কারণ" ভিত্তিক পদে থাকা এবং পুনরায় পূর্ববর্তী পদে পশ্চাদপসরণ হওয়া "ধারাবাহিকতা" রক্ষা করে কি? উপরন্তু প্রশ্ন উঠছে, অস্থায়ী সময়কালের জন্য জয়েন্ট চিফ্ ইনস্পেক্টর (কেমিক্যাল) পদে আসীন করার প্রাক্কালে অর্থদপ্তরের কোন মতামত নেওয়া হয়েছিল কি? অথবা এই পদে সাময়িকভাবে আসীন করাটা পদোন্নতির প্রাক্কালে নিয়মবদ্ধ করা হয়েছিল কি?

পরিশেষে বলা যায় যে, আধিকারিকের সিনিয়ারিটি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, যার পূর্ববর্তী পদোন্নতি নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে তাকে আবার চিফ্ ইনস্পেক্টর অব্ ফ্যাক্টরিস পদে উন্নীত করার প্রক্রিয়া নেওয়া হচ্ছে কেন? বর্তমানে জয়েন্ট চিফ্ ইনস্পেক্টর অব্ ফ্যাক্টরিস (মেইন) পদে তিনজন প্রবীণ (সিনিয়র) আধিকারিক আছেন, যারা আগের থেকে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন; ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভিসেস (ডিটারমিনেশন অব্ সিনিয়ারিটি) রুলস ১৯৮১-র নিয়ম অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদেরই একজনের পদোন্নতি হওয়া আইনসঙ্গত।

খোদ শ্রমমন্ত্রীর দপ্তরে আধিকারিকদের পদোন্নতির নীতিতে ধরা পড়ছে এক অদ্ভুত নিয়ম বহির্ভূতভাবে পক্ষপাতিত্বের নিদর্শন। কি জবাব দেবেন শ্রমমন্ত্রী?

- অমিতাভ সেনগুপ্ত

পরিচ্ছন্ন পায়খানার সুবিধা (শতাংশে)	১৯৯০	১৮	৩৯	-	১১	২৮	৭০	৪১
	২০১০	৩১	৫৩	৬৫	৩১	৪৫	৯১	৫৫
স্কুল পড়ার গড় সময় (বছরে)	১৯৯০	৩.০	২.৯	-	২.০	২.৩	৬.৯	৪.৯
	২০১০	৪.৪	৪.৮	-	৩.২	৪.৯	৮.২	৭.৬
কম ওজনের শিশুর সংখ্যা (শতাংশে)	১৯৯০	৫৯.৫	৬১.৫	৩৪	-	৩৯	২৯	১৩
	২০১০	৪৩.৫	৪১.৩	১২	৩৮.৮	-	২১.৬	৪.৫

- হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০১০

সি টি সি সহ রাজ্য সরকারি পরিবহন কর্মীদের ...

চারের পাতার পর

করেছে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মন্ত্রীদের দপ্তর সাজানো হচ্ছে। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ৪ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। একদিকে সংস্থাগুলোকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে বলা হচ্ছে অপরদিকে প্রতিটি সংস্থায় প্রতিটি ডিপোর বাস এবং ট্রামের সংখ্যা ব্যাপকমাত্রায় কমিয়ে আনা হয়েছে। আসলে সংস্থাগুলোকে রুগ্ন করে বামফ্রন্ট সরকারের দেখানো পথে (ফ্র্যাঞ্চাইজি দেওয়া বা রুট লিজ দেওয়া) ব্যক্তি মালিকানার হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে।

অজুহাত দুই—বিগত সরকারের আমলে সংস্থাগুলোতে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। তাই তদন্ত হচ্ছে। তাই বেতন পেতে দেরী হচ্ছে।

রাজ্য পরিবহন শিল্পে বিগত বামফ্রন্টের আমল থেকেই বেআইনি কর্মকাণ্ড, দুর্নীতি বা লুট চলছে তা প্রতিটি শ্রমিকেরই জানা। ১৫/১৬ বছর যাবত স্থায়ী কাজে হাজার হাজার শ্রমিকদের অস্থায়ী কর্মী হিসাবে খাটানো, শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি না দেওয়া, পি এফ-ই এস আই ফাঁকি দেওয়া, টাকার বিনিময়ে লাভজনক রুট বন্ধ করে ব্যক্তি মালিকদের ব্যবসার সুযোগ করে দেওয়া, সংস্থার সম্পত্তি বিক্রি করে অর্থ আত্মসাৎ করা ইত্যাদি। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? সরকারি আমলা এবং সংস্থার কর্তৃপক্ষরাই এর জন্য দায়ী। চক্রান্ত চলছে শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে আগামীদিনে শ্রমিক ছাঁটাই করার। তদন্ত হোক, দোষী সরকারি আমলা কর্তৃপক্ষের শাস্তি হোক কিন্তু শ্রমিক-কর্মচারীর অধিকার হরণ করা চলবে না।

পরিবহন শিল্পের কর্মীদের বেতনের অনিশ্চয়তা এক স্থায়ী রূপ নিতে চলেছে তাই এই শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের লড়াইটাও দীর্ঘস্থায়ী হবে বলেই আমরা মনে করছি।

আজ ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক-কর্মচারীরা। সরকারি আধা সরকারি ক্ষেত্রের সকল শ্রমিক-কর্মচারীরা আজ আক্রান্ত। এরকম এক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে প্রয়োজন এক ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন। তাই আসুন, সরকারের রং লাল, সবুজ, গেরুয়া বা তেরঙ্গা যাই হোক না কেন শ্রমিক-কর্মচারীরা অধিকার হরণের বিরুদ্ধে এক জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তুলি।

(১) অবিলম্বে রাজ্য সরকারি পরিবহন শিল্পের সকল শ্রমিক-কর্মচারীদের বকেয়া বেতন, বোনাস, ডিএ, গ্র্যাচুইটি ও পেনশন দিতে হবে। (২) যাত্রী ও সংস্থার স্বার্থে বাস ও ট্রামের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং বন্ধ রুট চালু করতে হবে। (২) পরিবহন শিল্পে সরকারি ভর্তুকি বন্ধ করা চলবে না। (৪) কোন অজুহাতেই একজন শ্রমিককেও ছাঁটাই করা চলবে না। (৫) দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি আমলা ও কর্তৃপক্ষের শাস্তি চাই। (৬) ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হরণ করা চলবে না।

আন্তর্জাতিক

ইউরোপের আর্থিক সংকট তীব্রতর — বাড়ছে প্রতিরোধও —

২০১০-এর মাঝামাঝি শুরু হওয়া গ্রীসের ঋণ সংকট ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও তার অভিন্ন মুদ্রা ইউরোর ভবিষ্যতকে অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড় করিয়েছিল। প্রায় দেড় বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর সেই সংকট নিরসনের কোন লক্ষণ চোখে পড়ছে না। তার পরিবর্তে গ্রীসের সংকট আরও গভীরতর হয়ে উঠে তাকে নিয়ে এসেছে বিপর্যয়ের কিনারে এবং ইতালি ও অন্য কয়েকটি দেশে তীব্র হয়ে ওঠা ঋণ সংকট ইউরোপ তথা বিশ্ব পুঁজিবাদের মাথাদের মাথাব্যথাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এই সংকট থেকে পরিত্রাণের পথ নিয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মাথারা স্পষ্টতই দিশাহারা। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, তার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং আই এম এফ—এই ত্রয়ী যে পথ অনুসরণে সংকটগ্রস্ত দেশগুলোকে বাধ্য করছে ও যে সমস্ত শর্তাবলী তাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে, তা শুধু সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে সামাজিক অস্থিরতাকেই বাড়িয়ে তুলছে না, তাদের গণতন্ত্রকেও প্রহসনে পরিণত করছে।

গ্রীসের জাতীয় ঋণের পরিমাণ বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১৩৮ বিলিয়ন ডলারে, যা তার জি ডি পি-র প্রায় ১৯০ শতাংশ। বোঝাই যাচ্ছে, গ্রীসের রপ্তানি অত্যন্ত কম, ঋণের ওপরেই সে কোনরকমে টিকে আছে এবং ঋণ নিয়ে তাকে আবার ঋণ শোধ করতে হচ্ছে। ঋণের পরিমাণ এইরকম হলে তা শুধু গ্রীস কেন, কোন দেশের পক্ষেই পরিশোধ করা সম্ভব নয়। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মাথারা এবং আই এম এফ অতএব সিদ্ধান্ত নিল—গ্রীসের ঋণদাতারা বা তার বণ্ডের ধারকরা গ্রীসের ঋণের ৫০ শতাংশ মকুব করে দেবে এবং গ্রীসের জন্য ১৭৯ বিলিয়ন ডলারের ত্রাণ প্যাকেজের ব্যবস্থা করা হবে, যে অর্থ গ্রীস পাবে বেশ কয়েকটি কিস্তিতে। তবে এই ব্যবস্থা নিঃশর্ত নয়, তারা যে শর্তবলী দেবে তার রূপায়ণে গ্রীসকে আন্তরিক ও কঠোর হতে হবে। সেই শর্তাবলী অবশ্য নতুন কিছু নয়, সংকট থেকে গ্রীসকে তথাকথিত উদ্ধারের মূল্য স্বরূপ যে মাশুল গ্রীসের কমিশনার। ইতালির ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রীকে ঐ ত্রয়ীরই বেছে দেওয়া। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর মন্টিও বলেছেন, আর্থিক কঠোরতার কর্মসূচীকে তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবেই রূপায়িত করবেন।

ইউরোপের দেশগুলোর ঋণ পরিশোধের অক্ষমতা কোন নতুন পরিঘটনা নয়। গ্রীস, স্পেন, ইতালি, পর্তুগাল, আয়ারল্যাণ্ডের মত দেশগুলোর অর্থনীতির লালবাতি জ্বলার মত অবস্থা তো বেশ কিছুকাল আগেই সামনে এসেছিল, চলতি ব্যবস্থার সংকটরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু আজকের পরিস্থিতিতে যে প্রশ্নটা বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে তা হল—ঐ সংকট নিরসনের যে দাওয়াই ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন, তার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং আই এম এফ বাতলে ছিল, তা জাতীয় অর্থনীতিগুলোর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পরিবর্তে ঋণ সংকটকে গভীরতর করে তুলেছে। আজকেও যে পথের অনুসরণে গ্রীস, ইতালিকে বাধ্য করা হচ্ছে তা সেই আগের পথেরই পুনরাবৃত্তি এবং আরও বেশী মাত্রায়। এই পথের কাছে সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণের স্বার্থ, তাদের জীবন-জীবিকার প্রশ্নের কোন ঠাঁই নেই, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও নির্বাচিত সরকারের গুরুত্বও গৌণ। ডুবে যাওয়া থেকে লগ্নিকারি ব্যাঙ্কগুলোকে বাঁচানোই তার চূড়ান্ত অগ্রাধিকার। গ্রীস ও ইতালি যদি ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয় তবে ঐ দেশগুলোর বণ্ডে লগ্নিকারি ব্যাঙ্কগুলোর আর্থিক বিপর্যয় ঘটবে। কোন দেশ দেউলিয়া ঘোষিত হলে সেখানকার বণ্ডে লগ্নিকারি ব্যাঙ্কের অর্থও তামাদি বলে ঘোষিত হয়ে ব্যাঙ্কগুলোও দেউলিয়া হয়ে যাবে। তৈরি হবে অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাসের এক বাতাবরণ যা লগ্নিকারির আত্মবিশ্বাসে ঘা দিয়ে লগ্নির পরিমণ্ডলকেই বিপর্যস্ত করে তুলবে। ঋণ সংকট শুধু গ্রীস ও ইতালিতে সীমাবদ্ধ না থেকে গ্রাস করবে ইউরোপের অন্যান্য দেশকে। লগ্নিকারিদের স্বার্থরক্ষা ও আত্মবিশ্বাসের পুনরুদ্ধার এবং তার মধ্যে দিয়ে চালু ব্যবস্থাটাকে রক্ষার তাগিদই গ্রীস ও ইতালির পথ নির্ধারণের নির্ধারক শর্ত হয়ে দেখা দিয়েছে।

নয়, তারা যে শর্তবলী দেবে তার রূপায়ণে গ্রীসকে আন্তরিক ও কঠোর হতে হবে। সেই শর্তাবলী অবশ্য নতুন কিছু নয়, সংকট থেকে গ্রীসকে তথাকথিত উদ্ধারের মূল্য স্বরূপ যে মাশুল গ্রীসের জনগণকে ২০১০ সালে দিতে হয়েছিল, এবারের শর্তাবলী তারই ধারাবাহিকতা ও বিস্তৃততর রূপ। অর্থাৎ গ্রীসের সরকারকে বাজেটে ভালোমাত্রায় ছাঁটকাট করতে হবে, সামাজিক তথা উন্নয়ন খাতে ব্যয়কে ব্যাপক হারে কমিয়ে আনতে হবে, পেনশনে ছাঁটাই করতে হবে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বেতন কমিয়ে আনতে হবে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য পরিষেবাকে যথেষ্ট মাত্রায় খর্বিত করতে হবে ইত্যাদি। গ্রীসের মানুষ অবরোধ-ধর্মঘট-মিছিল-বিক্ষোভ দিয়ে ২০১০-এর কঠোরতার কর্মসূচীর প্রতি তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। ঐ ত্রয়ীর এবারের চাপানো শর্তকেও কি তাঁরা মেনে নেবেন?

প্রধানমন্ত্রী পাপান্দ্রিউ খুব ভালো করেই জানতেন যে, এই শর্তাবলীকে মেনে নিয়ে রূপায়িত করতে গেলে তা শুধু সামাজিক বিক্ষোভকেই বহুগুণ বাড়িয়ে তুলবে না, ইতিমধ্যেই তলানিতে ঠেকা তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতাও ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাবে। এই সমস্ত শর্তাবলীর জন্য তিনি গণভোট নেওয়ার কথা বললেন। অর্থাৎ, টিকে থাকতে গেলে, দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পরিণতি থেকে রক্ষা পেতে গেলে, আবারও ঋণ নেওয়া ছাড়া গ্রীসের সামনে অন্য কোন পথ নেই। গ্রীসের জনগণ, এই শর্তগুলোকে অতএব মেনে নাও। কিন্তু প্রমাদ গুনল ইউরোপের মাথারা এবং আই এম এফ। আর্থিক কঠোরতার কর্মসূচী গ্রীসের জনগণের কি দশা করেছে ও তার প্রতি গ্রীসের জনগণের মনোভাব কি, তা তাঁরা খুব ভালো করেই জানেন। গণভোটে গ্রীসের জনগণের রায়ে এই সমস্ত শর্তাবলী সহ ঋণচুক্তি যে প্রত্যাখ্যাত হবে তা নিয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ রইল না। গণভোটের পদক্ষেপ ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ও ১৭ দেশের

অভিন্ন মুদ্রা ইউরোর ভবিষ্যতকে এক বিরাট প্রশ্নের মধ্যে ঠেলে দিল। ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের হর্তাকর্তারা, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং আই এম এফ চাপ বাড়াতে লাগল পাপান্দ্রিউ ও গ্রীস সরকারের ওপর। বলা হল, গণভোটের ব্যাপারে ফয়সালা না হলে (অর্থাৎ, গণভোট থেকে সরে না এলে) গ্রীসকে কোন ঋণ দেওয়া হবে না। গ্রীসের মন্ত্রীসভা গণভোটের সিদ্ধান্তকে পাশ করানোর পরও গণভোট থেকে গ্রীসকে সরে আসতে হল। সংসদে ঋণ চুক্তিকে পাশ করানোর পর ইস্তফা দিতে হল পাপান্দ্রিউকে। নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন ইউরোপের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট লুকাস পাপাডেমস, যাঁকে গ্রীসের সাংসদরা নির্বাচিত করলেন না, যাঁকে ঠিক করে দিল ঐ ত্রয়ী। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সরকারের ওপর আই এম এফ এবং বিশ্বব্যাঙ্কের মত আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থাগুলোর যে চাপ দেখতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম, প্রথম বিশ্বের প্রান্তিক দেশ গ্রীসের ক্ষেত্রেও এখন সেটা ঘটতে দেখা গেল। গ্রীস কোন পথে যাবে, গ্রীসের নেতৃত্ব কে দেবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা গ্রীসের জনগণের, তার সংসদের নেই। বাইরে থেকে সেটা ঠিক করে দিচ্ছে পুঁজিবাদের মাথারা, এথেন্স নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ব্রাসেলসের হাতে।

ইতালির পরিণতিও গ্রীসের থেকে খুব কিছু আলাদা হল না। জাতীয় ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সংকটাপন্ন দেশগুলোর তালিকার ওপর দিকেই ছিল তার অবস্থান। ইতালির ক্ষেত্রে আশঙ্কার আরও বড় কারণ হল, ইতালি ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি (ইতালি জি-৭ গোষ্ঠীরও অন্তর্ভুক্ত) যার আকার গ্রীসের চেয়ে অনেক বড়। এতটাই বড় যে তার বেলআউট বা উদ্ধার একরকম অসম্ভব। ইতালি দেউলিয়া হয়ে গেলে তার ধাক্কা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ওপর এতটাই জোরালো হবে যে, অতলে তলিয়ে যাওয়ার নিয়তি থেকে তার বাঁচাটা দুষ্কর হয়ে উঠবে। ইতালির জাতীয় ঋণ গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২.৬ ট্রিলিয়ন ডলারে, যেটা তার জি ডি পি-র ১২০ শতাংশ। হাঁড়ির হাল বুঝে ওঠা অতএব শক্ত নয়। বণ্ড ছেড়ে তার টাকায় ঋণ শোধ করতে হচ্ছে। ফলে ঋণ বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে বণ্ডের সুদের হারও লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে, যা ছাড়িয়ে গিয়েছিল ৭ শতাংশকে, বিশেষজ্ঞদের মতে যার ভার সহ্য করার ক্ষমতা বা ঐ হারে সুদের সঙ্গে আসলকে শোধ করা ইতালির অর্থনীতির নেই। উঠল সামাল সামাল রব। কোমর কষতে হবে ইতালিকে, দীর্ঘদিন ধরে যাঁর শাসনে ইতালি এই অবস্থায় পৌঁছল, সেই বার্লুস্কোনিকেও আর ক্ষমতায় রাখা যাবে না। অতএব, ইতালির জন্যও আর্থিক কঠোরতার কর্মসূচী এবং বার্লুস্কোনির বিদায়। বার্লুস্কোনির মূল অপরাধ এই নয় যে, তিনি যৌন ও ঘুষ কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত। তাঁর প্রধান অপরাধ হল, ইতালির ঋণ পরিশোধের ক্ষমতার চূড়ান্ত অবনতি ঘটিয়ে তিনি লগ্নিকারী ব্যাঙ্কগুলোকে (অর্থাৎ যারা ইতালির বণ্ড কিনেছে) বিপন্ন করে তুলেছেন (শুধুমাত্র জার্মান ব্যাঙ্কগুলোর কাছেই ইতালির ঋণের পরিমাণ হল ১১৬ বিলিয়ন ইউরো)। ইতালির নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন মারিও মন্টি, যিনি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রাক্তন ইউরোপের অন্যান্য দেশকে। লগ্নিকারিদের স্বার্থরক্ষা ও আত্মবিশ্বাসের পুনরুদ্ধার এবং তার মধ্যে দিয়ে চালু ব্যবস্থাটাকে রক্ষার তাগিদই গ্রীস ও ইতালির পথ নির্ধারণের নির্ধারক শর্ত হয়ে দেখা দিয়েছে।

আগের চেয়ে একটা ফারাক অবশ্য চোখে পড়ছে। গ্রীস ও ইতালির নতুন সরকারগুলোকে বলা হচ্ছে 'টেকনোক্র্যাটদের' সরকার। দেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত ও তাদের পছন্দের সরকার নয়, দুই দেশের নেতৃত্বে বসানো লগ্নি বিশেষজ্ঞ নতুন টেকনোক্র্যাটরাই নাকি ঐ দেশগুলোকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাবেন, সংকটের ছড়িয়ে পড়াকে আটকাতে পারবেন। কিন্তু পথটা তো সেই পুরনো—যে পথে ঐ দেশগুলোর জনগণকে ভাতে মেরে অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের কথা তাদের কাছে এক নিষ্ঠুর রসিকতা হয়েই দেখা দিচ্ছে, যার জবাব তাঁরা দিচ্ছেন বিক্ষোভ-ধর্মঘট-অবরোধের মধ্যে দিয়ে। আর্থিক কঠোরতার কর্মসূচী, গ্রীস-ইতালির অর্থনীতির ওপর ত্রয়ীর নিয়োগ করা ব্যক্তিদের নিয়মিত নজরদারি, সংকটগ্রস্ত দেশকে বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য ইউরোপীয় আস্থিক স্থিতিশীলতা তহবিলকে ২০১০-এর ৪৪০ বিলিয়ন থেকে বাড়িয়ে ১ ট্রিলিয়ন ইউরো করার প্রস্তাব—এই সমস্ত পদক্ষেপ ঋণ সংকটে টালমাটাল ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অখণ্ডতাকে বা নির্মম পরিণতির হাত থেকে ইউরোকে রক্ষা করতে পারে কিনা তা দেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তবে এই কথাটা কিন্তু নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া অর্থনৈতিক নির্মমতা ও সামাজিক অবহেলাকে ইতালি, গ্রীস ও অন্যান্য দেশের জনগণ কখনই মেনে নেবেন না, বাজার দর্শন ও লগ্নির দাপটে ক্রমেই আরও বেশি করে প্রতিরোধের মুখে পড়বে পুঁজিবাদের অন্যতম দুর্গ ইউরোপের বুকে।

- জয়দীপ মিত্র

সি পি আই (এম-এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা - ৫৪ হইতে মুদ্রিত ও ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹- ২ ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com